তৃতীয় অধ্যায়

কোষ রসায়ন

CELL CHEMISTRY

প্রধান শব্দসমূহ : কার্বোহাইড্রেট, লিপিড, অ্যামিনো অ্যাসিড, প্রোটিন, সুক্রোজ, এনজাইম।

প্রতিটি জীবদেহ কতগুলো রাসায়নিক উপাদানে গঠিত। এসব রাসায়নিক উপাদানগুলো কোষনির্ভর। কোষস্থ বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক পদার্থ সম্বন্ধে তোমরা এ অধ্যায়ে জানতে পারবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

১. জীবের রাসায়নিক উপাদান সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে।
২. কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও লিপিডের শ্রেণিবিন্যাস বর্ণনা করতে পারবে।
৩. জীবদেহে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও লিপিডের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
৪. উৎসেচক এর ক্রিয়ার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৫. উৎসেচক এর শ্রেণিবিন্যাস বর্ণনা করতে পারবে।
৬. বিভিন্ন জৈবিক কার্যক্রমে উৎসেচকের ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারবে।

জীবকোষের রাসায়নিক উপাদান (Biochemicals in Cell)

কোষ হলো জীবদেহের গঠন ও কাজের একক। কোষে জীবন ধারণের সব উপাদান তৈরি হয় এবং বিরাজ করে। উদ্ভিদদেহও বিভিন্ন অজৈব ও জৈব পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত। উদ্ভিদের জীবন গঠন ও জীবন ধারণের জন্যে বহু রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োজন হয়। এদের অনেকগুলোই দেহের অভ্যন্তরে তথা কোষাভ্যন্তরে সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানের যে শাখায় কোষস্থ বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক উপাদানগুলোর বর্ণনা, পঠন-পাঠন ও গবেষণা করা হয় তাকে **জৈব রসায়ন** (Biochemistry) বলা হয়। সজীব উদ্ভিদদেহ বিশ্লেষণ করলে প্রধান যে উপাদান পাওয়া যায় তা হলো পানি। দেহের প্রায় শতকরা ৬০-৯০ অংশ হলো পানি। বাকি যে অংশ অবশিষ্ট থাকে তাকে **কঠিন বস্তু** (solid matters) বলে। ১৭টি মৌলিক পদার্থ, যেমন- C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, Fe, Na, Cl, Mn, B, S, Mo, Cu ও Zn মিলে সৃষ্টি করেছে অসংখ্য জৈব উপাদান। জৈব রাসায়নিক পদার্থগুলোর মধ্যে কার্বোহাইড্রেট, লিপিড, অ্যামিনো অ্যাসিড, প্রোটিন, নিউক্লিক অ্যাসিড, অন্যান্য জৈব অ্যাসিড, বিভিন্ন এনজাইম ইত্যাদি প্রধান। অজৈব পদার্থের মধ্যে পানি অন্যতম। সাধারণত দুগ্ধজাত খাদ্য, মাছ, মাংস, ডিম, ডাল, শস্যদানা, শাকসবজি, ফলমূল ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে অজৈব লবণ বা খনিজ লবণ বিদ্যমান থাকে। নিম্নে কয়েকটি জৈব পদার্থ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হলো। জীবদেহের প্রধান জৈব পদার্থ হলো কার্বোহাইড্রেট, লিপিড, প্রোটিন এবং নিউক্লিক অ্যাসিড।

কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrates) বা শর্করা

জীবদেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ গাঠনিক উপাদান ও সঞ্চয়ী উপাদান হলো কার্বোহাইড্রেট। আমাদের খাদ্য তালিকার প্রধান উপাদানও কার্বোহাইড্রেট। কার্বোহাইড্রেট কী? সাধারণভাবে, কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সমন্বয়ে গঠিত যৌগকে **কার্বোহাইড্রেট** বলে; যেখানে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অনুপাত ১ : ২ : ১ যেমন- গ্লুকোজ ($C_6H_{12}O_6$)। তবে অনেক যৌগ আছে যেখানে এমন অনুপাত না থাকলেও সেটা কার্বোহাইড্রেট; যেমন- সুক্রোজ ($C_{12}H_{22}O_{11}$)। আবার এমন অনুপাত থাকলেও সেটা কার্বোহাইড্রেট নয়; যেমন- ফরম্যালডিহাইড (HCHO), অ্যাসিটিক অ্যাসিড (CH_3COOH) ইত্যাদি (কারণ এখানে অনুপাত ঠিক নেই)। আধুনিক ধারণা অনুসারে নাইট্রোজেন বা সালফার সমৃদ্ধ সামান্য কিছু যৌগকেও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কারণে কার্বোহাইড্রেটের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাই বর্তমান ধারণা অনুযায়ী, যে সকল অ্যালডিহাইড বা কিটোন জাতীয় যৌগে কতগুলো হাইড্রোক্সিল গ্রুপ থাকে অথবা যারা আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে কতগুলো হাইড্রোক্সিল গ্রুপযুক্ত অ্যালডিহাইড বা কিটোন উৎপন্ন করে সেসব যৌগকে কার্বোহাইড্রেট বলে।

হাইড্রেট অব কার্বন' থেকে কার্বোহাইড্রেট নামকরণ হয়েছে। এর অর্থ দাঁড়ায় 'কার্বনের জলায়ন' অর্থাৎ এক অণু কার্বনের সাথে এক অণু কার্বন (CH_2O) এই অনুপাতে গঠিত বিভিন্ন প্রকার যৌগ (Diverse compounds based on the general formula CH_2O are carbohydrates)। এই সাধারণ ফর্মুলাটি কেবলমাত্র মনোস্যাকারাইড্স- এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (যেমন গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ ইত্যাদি)। একাধিক মনোস্যাকারাইড সহযোগে যে সব কার্বোহাইড্রেট গঠিত হয় ঐ সব ক্ষেত্রে এই সাধারণ ফর্মুলা প্রয়োজ্য নয়। যখন এক অণু গ্লুকোজ ও এক অণু ফ্রুক্টোজ গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনীর মাধ্যমে একত্র হয়ে এক অণু সুক্রোজ গঠন করে তখন এই সাধারণ ফর্মুলা কার্যকরী হয় না, কারণ বন্ধনী সৃষ্টিকালে এক অণু পানি (H_2O) বের হয়ে যায়, তাই সুক্রোজ-এর ফর্মুলা দাঁড়ায় $C_{12}H_{22}O_{11}$। অধিকাংশ উদ্ভিদদেহে শুকনো ওজনের ৫০-৮০ ভাগ কার্বোহাইড্রেট থাকে। সারা বিশ্বে সকল জৈব বস্তুর মধ্যে কার্বোহাইড্রেট সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় যা জীবদেহের গাঠনিক উপাদান ও সঞ্চয়ী উপাদান হিসেবে থাকে।

কার্বোহাইড্রেট (কার্বোহাইড্রেট) বৈশিষ্ট্য

১। এটি দানাদার (চিনি), তন্তুময় (সেলুলোজ) ও পাউডার জাতীয় পদার্থ।
২। এরা স্বাদে মিষ্টি (সুক্রোজ) বা স্বাদহীন (সেলুলোজ)।
৩। তাপ প্রয়োগে অঙ্গারে পরিণত হয়।
৪। পানিতে অধিকাংশই দ্রবণীয় (সরল ও অলিগো কার্বোহাইড্রেট)
৫। এসিডের সাথে মিশে এস্টার গঠন করে।
৬। এরা আলোক সক্রিয় ও আলোক সমাণুতা প্রদর্শন করে।

জীবদেহে কার্বোহাইড্রেট-এর কাজ : নিচে কার্বোহাইড্রেট-এর কাজ উল্লেখ করা হলো।

১। জীব দেহের শক্তির প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে এবং জারিত হয়ে শক্তি উৎপন্ন করে।
২। উদ্ভিদের সাপোর্টিং টিস্যুর গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে।
৩। উদ্ভিদদেহ গঠনকারী পদার্থগুলোর কার্বন কাঠামো (carbon skeleton) প্রদান করে।
৪। প্রাণিদেহে হাড়ের সন্ধিস্থলে লুব্রিকেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
৫। উদ্ভিদ দেহে সঞ্চয়ী পদার্থ হিসেবে বিরাজ করে।
৬। ক্যালভিন চক্র, ক্রেবস্ চক্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ চক্রে কার্বোহাইড্রেট সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।
৭। বিভিন্ন প্রকার কো-এনজাইমের গাঠনিক অংশ হিসেবে থাকে। যেমন-ATP, NADP, FAD ইত্যাদি।
৮। ফ্যাটি অ্যাসিড ও অ্যামিনো অ্যাসিড বিপাকে সাহায্য করে।
৯। নিউক্লিক অ্যাসিডের অন্যতম উপাদান রাইবোজ ও ডিঅক্সিরাইবোজ হলো পেন্টোজ জাতীয় শর্করা (কার্বোহাইড্রেট)

কার্বোহাইড্রেট-এর শ্রেণিবিভাগ

(ক) স্বাদের ওপর ভিত্তি করে কার্বোহাইড্রেট দু' প্রকার, যথা- (১) শ্যুগার : এরা স্বাদে মিষ্টি, দানাদার এবং পানিতে দ্রবণীয়, যেমন- গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, সুক্রোজ ইত্যাদি; (২) নন-শ্যুগার : এরা স্বাদে মিষ্ট নয়, অদানাদার এবং পানিতে অদ্রবণীয়, যেমন- স্টার্চ, সেলুলোজ, গ্লাইকোজেন ইত্যাদি।

(খ) রাসায়নিক গঠন অণুর ভিত্তিতে কার্বোহাইড্রেটকে প্রধানত চার শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। এগুলো হলো- ১। মনোস্যাকারাইড (Monosaccharides); ২। ডাইস্যাকারাইড (Disaccharides); ৩। অলিগোস্যাকারাইড (Oligosaccharides) এবং ৪। পলিস্যাকারাইড (Polysaccharides)। নিম্নে রাসায়নিক গঠন অনুযায়ী কার্বোহাইড্রেটের বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো।

১। মনোস্যাকারাইড (Monosaccharides) : গ্রিক *mono* = এক, saccharin = sugar বা চিনি) : যে কার্বোহাইড্রেটকে হাইড্রোলাইসিস করলে আর কোনো সরল কার্বোহাইড্রেট একক পাওয়া যায় না সেগুলো মনোস্যাকারাইড। মনোস্যাকারাইড অন্যান্য জটিল কার্বোহাইড্রেট তৈরির গাঠনিক ইউনিট (building unit) হিসেবে কাজ করে। এর সাধারণ সংকেত হচ্ছে $C_nH_{2n}O_n$। মনোস্যাকারাইডসমূহে একটি মুক্ত অ্যালডিহাইড গ্রুপ (–CHO) বা কিটোন গ্রুপ (–CO–) এবং একাধিক হাইড্রোক্সিল (–OH) গ্রুপ থাকে। মনোস্যাকারাইডে কার্বনের সংখ্যা ৩-১০। কার্বনের সংখ্যা অনুযায়ী মনোস্যাকারাইডকে তিন কার্বনবিশিষ্ট ট্রায়োজ (triose), চার কার্বনবিশিষ্ট টেট্রোজ (tetrose), পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট পেন্টোজ (pentose), ছয় কার্বনবিশিষ্ট হেক্সোজ (hexose), সাত কার্বনবিশিষ্ট হেপ্টোজ (Heptose) ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা হয়। জীবদেহের অধিকাংশ মনোস্যাকারাইড অপ্টিক্যাল আইসোমারের D সিরিজভুক্ত।

মনোস্যাকারাইডগুলোতে অ্যালডিহাইড গ্রুপ (–CHO) বা কিটোন গ্রুপ (>C=O) মুক্তভাবে থাকায় এরা বিজারক (reducing) পদার্থ হিসেবে কাজ করে। কাজেই –CHO বা, >C=O গ্রুপ যুক্ত কার্বোহাইড্রেটকে রিডিউসিং শুগার (reducing sugar) বলা হয়। বেনেডিক্ট দ্রবণের $Cu(OH)_2$ (কিউপ্রিক হাইড্রোক্সাইড) উক্ত শ্যুগারের –CHO বা, C = O গ্রুপের সাথে বিক্রিয়া করে কিউপ্রাস অক্সাইড-এ (Cu_2O) পরিণত হয়, যা লাল বর্ণের অধঃক্ষেপ হিসেবে জমা হয়। রিডিউসিং শ্যুগার পরীক্ষা করতে তাই এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়। মনোস্যাকারাইডসমূহ সাধারণত মিষ্টি স্বাদবিশিষ্ট।

(i) ট্রায়োজ (triose, $C_3H_6O_3$) : তিন কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে বলা হয় ট্রায়োজ। গ্লিসার‍্যালডিহাইড এবং ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটোন হলো দুটি সরল ট্রায়োজ। এরা দ্রবণীয় মনোস্যাকারাইড। উদ্ভিদে এরা ফসফেট এস্টার হিসেবে কাজ করে। গ্লিসার‍্যাল্ডিহাইড-এর ১নং কার্বনে একটি কার্বনাইল অক্সিজেন যুক্ত হয়ে একে অ্যালডিহাইড গ্রুপ নির্দেশ করে এবং ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটোনের ২নং কার্বনে কার্বনাইল অক্সিজেন যুক্ত হয়ে একে কিটোন গ্রুপ নির্দেশ করে। কাজেই গ্লিসার‍্যাল্ডিহাইড হলো একটি অ্যালডোজ (aldose) এবং ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটোন হলো একটি কিটোজ (ketose)। অ্যালডিহাইড এবং কিটোন গ্রুপকে বলা হয় রিডিউসিং গ্রুপ (reducing group) কারণ এরা সহজেই কতিপয় যৌগের সাথে জারিত (oxidation) হয়ে যায় এবং ঐ যৌগ বিজারিত (reduction) হয়। তাই অ্যালডিহাইড ও কিটোন গ্রুপযুক্ত চিনিকে বলা হয় রিডিউসিং শ্যুগার (reducing sugar) বা বিজারক শর্করা।

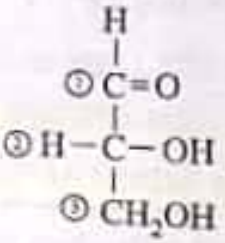
গ্লিসার‍্যাল্ডিহাইড (অ্যালডোজ)

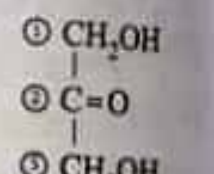
ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটোন (কিটোজ)

(ii) টেট্রোজ (tetrose, $C_4H_8O_4$) : চার কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে বলা হয় টেট্রোজ। ইরিথ্রোজ (erythrose) হলো একটি টেট্রোজ। উদ্ভিদে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি ইরিথ্রোজ-4 ফসফেট হিসেবে বিরাজ করে। ক্যালভিন চক্রে এর ভূমিকা আছে।

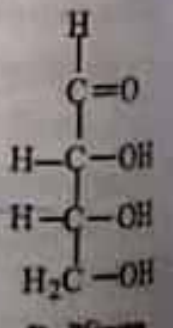
D- ইরিথ্রোজ

(iii) পেন্টোজ (pentose, $C_5H_{10}O_5$) : পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে বলা হয় পেন্টোজ। জাইলোজ, রাইবোজ, ডিঅক্সিরাইবোজ, রাইবুলোজ ইত্যাদি হলো পেন্টোজ শ্যুগার-এর উদাহরণ।

■ **রাইবোজ (ribose) :** এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট পেন্টোজ শ্যুগার। ১৮৯১ সালে Emil Fisher এটি আবিষ্কার করেন। এটি রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিডের (RNA) একটি গঠন একক। এর আণবিক সংকেত $C_5H_{10}O_5$। এতে একটি (–CHO) গ্রুপ থাকায় এদের অ্যালডোপেন্টোজ বলা হয়। রাইবোজ শর্করার গলনাঙ্ক ৯৫° সে., গাঢ় HCl এর সাথে বিক্রিয়া করে ফারফিউরাল অ্যাসিড উৎপন্ন করে। RNA-তে কেবলমাত্র রাইবোজ শ্যুগারই নিউক্লিয়োটাইড বা নিউক্লিয়োসাইড তৈরিতে অংশগ্রহণ করে। এটি নির্দিষ্ট পিউরিন বা পাইরিমিডিন বেস এর

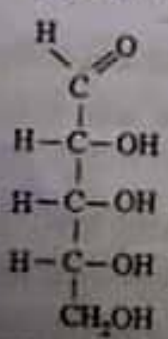
D-রাইবোজ (ফেইন স্ট্রাকচার)

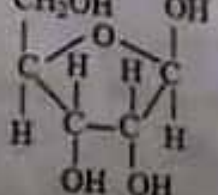
D-রাইবোজ (হিং স্ট্রাকচার)

...যুক্ত হয়ে একটি নিউক্লিয়োসাইড উৎপন্ন করে। নিউক্লিয়োসাইডের সাথে একটি অজৈব ফসফেট যুক্ত হয়ে নিউক্লিয়োটাইডে পরিণত হয়। কার্বন বিজারণের মাধ্যমে শর্করা তৈরি প্রক্রিয়াতেও রাইবোজ ভূমিকা পালন করে। ATP, NAD, $NADP^+$, FAD, Co-A ইত্যাদি জৈব অণুর সাথেও রাইবোজ যুক্ত থাকে। রাইবোজ বিজারণ ক্ষমতাসম্পন্ন।

• **ডিঅক্সিরাইবোজ (deoxyribose) :** ডিঅক্সিরাইবোজ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পেন্টোজ শ্যুগার। এর আণবিক সংকেত $C_5H_{10}O_4$। এতে একটি অ্যালডিহাইড (–CHO) গ্রুপ (বিজারণ ক্ষমতাসম্পন্ন) থাকায় একে ডিঅক্সি-অ্যালডোপেন্টোজও বলে। এটি রাইবোজ শ্যুগার-এর সাথে পার্থক্য শুধু এই যে, এর ২নং কার্বনে –OH গ্রুপের পরিবর্তে কেবল একটি হাইড্রোজেন (H) পরমাণু আছে। ডিঅক্সি অর্থ হলো অক্সিজেন ছাড়া (without oxygen) অর্থাৎ ২নং কার্বনে কোনো অক্সিজেন নেই। এর ১নং কার্বন অবস্থানে যে কোনো একটি পিউরিন বা পাইরিমিডিন বেস (A, T, G, C) যুক্ত হলে একটি ডিঅক্সিনিউক্লিয়োসাইড সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় ৫নং কার্বন অবস্থানে অজৈব ফসফেট যুক্ত হলে একটি ডিঅক্সিনিউক্লিয়োটাইড সৃষ্টি হয়। DNA-নিউক্লিক অ্যাসিডের নিউক্লিয়োটাইড গঠনের অংশ হিসেবে বিরাজ করে ডিঅক্সিরাইবোজ শ্যুগার। এই শ্যুগার ছাড়া DNA গঠন সম্ভব নয়। ডিঅক্সিরাইবোজ বিজারণ ক্ষমতাসম্পন্ন।

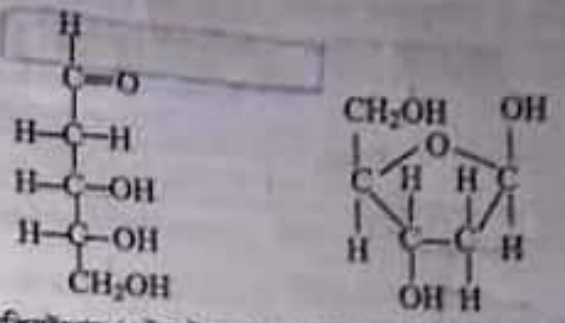

D-2, ডিঅক্সিরাইবোজ (চেইন স্ট্রাকচার)

β-D-2, ডিঅক্সিরাইবোজ (রিং স্ট্রাকচার)

পার্থক্যের বিষয়	রাইবোজ $C_5H_{10}O_5$	ডিঅক্সিরাইবোজ $C_5H_{10}O_4$
১। উপাদান	এটি হলো RNA এর অপরিহার্য উপাদান।	এটি হলো DNA এর অপরিহার্য উপাদান।
২। অ্যাসিড	গাঢ় HCl অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে ফারফিউরাল অ্যাসিড তৈরি করে।	গাঢ় HCl অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে লেভুলিনিক অ্যাসিড তৈরি করে।
৩। অক্সিজেন পরমাণু	আণবিক গঠনে ৫টি অক্সিজেন পরমাণু থাকে।	আণবিক গঠনে ৪টি অক্সিজেন পরমাণু থাকে।
৪। গ্রুপ	২নং কার্বন পরমাণুর সাথে –OH গ্রুপ থাকে।	২নং কার্বন পরমাণুর সাথে –OH গ্রুপ থাকে না।
৫। অংশগ্রহণ	নিউক্লিয়োটাইড ও শর্করা তৈরিতে অংশগ্রহণ করে।	ডিঅক্সিনিউক্লিয়োটাইড গঠনে অংশগ্রহণ করে।

(iv) হেক্সোজ (hexose, $C_6H_{12}O_6$) : ৬ কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে বলা হয় হেক্সোজ। গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, ম্যানোজ, গ্যালাক্টোজ হলো প্রধান প্রধান হেক্সোজ। এরা উদ্ভিদ কোষে মুক্ত অবস্থায় অথবা অন্য জটিল কার্বোহাইড্রেট-এর অংশ হিসেবে বিরাজ করে। সাধারণত গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজকে মুক্ত অবস্থায় সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়।

• **গ্লুকোজ (Glucose) :** গ্লুকোজ বা ডেক্সট্রোজ একটি উল্লেখযোগ্য মনোস্যাকারাইড। উদ্ভিদ কোষে দ্রবণীয় অবস্থায় একে পাওয়া যায়। এর আণবিক সংকেত $C_6H_{12}O_6$। এটি একটি অ্যালডোহেক্সোজ কারণ এতে অ্যালডিহাইড গ্রুপ (–CHO) আছে। এটি একটি রিডিউসিং শ্যুগার।

বিভিন্ন প্রকার পাকা ফল ও মধুতে প্রচুর গ্লুকোজ থাকে। পাকা আঙ্গুরে গ্লুকোজের পরিমাণ শতকরা ১২-৩০ ভাগ। একে অনেক সময় গ্রেইপ শ্যুগার (grape sugar) বা আঙ্গুরের শর্করা বলা হয়। উদ্ভিদে গ্লুকোজ কখনো সঞ্চিত পদার্থ হিসেবে বিরাজ করে না। শ্বসনের প্রাথমিক পদার্থ হলো গ্লুকোজ।

উৎপাদন ও প্রস্তুত প্রণালি : প্রকৃতিতে সবুজ উদ্ভিদ থেকে গ্লুকোজ উৎপাদিত হয়। আবার গবেষণাগারে হাইড্রোলাইসিস করে সুকরোজ ও স্টার্চ থেকে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ প্রস্তুত করা যায়।

বৈশিষ্ট্য : গ্লুকোজ সাদা দানাদার পদার্থ। স্বাদে মিষ্টি এবং পানিতে সহজেই দ্রবণীয়। এটি অ্যালকোহলে সামান্য দ্রবণীয় কিন্তু ইথারে অদ্রবণীয়।

গ্লুকোজের ব্যবহার : রোগীর পথ্য হিসেবে গ্লুকোজ-এর বহুল ব্যবহার প্রচলিত। বিভিন্ন ফল সংরক্ষণে গ্লুকোজ ব্যবহার করা হয়। ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট হিসেবে ওষুধ শিল্পে গ্লুকোজ ব্যবহৃত হয়। ভিটামিন 'সি' তৈরি করার জন্য গ্লুকোজ ব্যবহৃত হয়। গ্লুকোজ কার্বোহাইড্রেট বিপাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ্লুকোজের রিং স্ট্রাকচার এবং α/β-D গ্লুকোজ : গ্লুকোজের ১নং কার্বন এবং ৫নং কার্বন কাছাকাছি এসে (যা সাধারণত কাছাকাছি আসে) এদের মধ্যে একটি অক্সিজেন সেতু তৈরি হয়। এর ফলে ১নং কার্বনে একটি -OH গ্রুপ মুক্ত হয়। নতুন সৃষ্ট এই -OH গ্রুপ ১নং কার্বনের α (আলফা) অথবা β (বিটা) অবস্থানে থাকতে পারে। -OH গ্রুপের এই α এবং β অবস্থানের কারণে গ্লুকোজের ভৌত, রাসায়নিক এবং জৈবিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটে; যেমন- β-গ্লুকোজ গঠন করে সেলুলোজ, কিন্তু α-গ্লুকোজ গঠন করে স্টার্চ। সেলুলোজ কোষের গাঠনিক বস্তু এবং স্টার্চ কোষের সঞ্চয়ী খাদ্য।

D-গ্লুকোজ (চেইন স্ট্রাকচার)

L-গ্লুকোজ (চেইন স্ট্রাকচার)

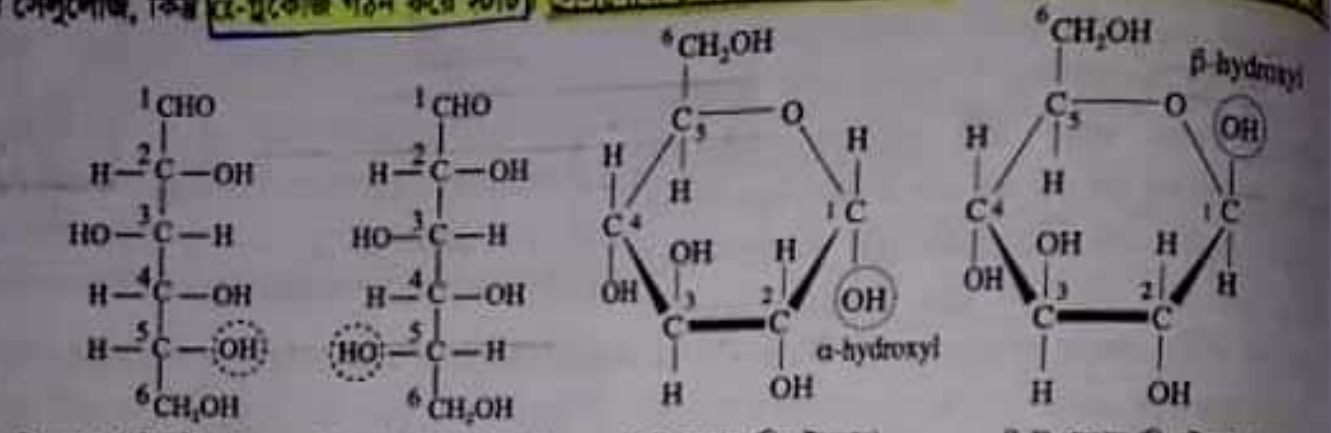

α-D-গ্লুকোজ (রিং স্ট্রাকচার)

β-D-গ্লুকোজ (রিং স্ট্রাকচার)

D এবং L গ্লুকোজ : গ্লুকোজের ৫নং কার্বনে সংযুক্ত (-OH) মূলক ডান দিকে থাকলে তাকে বলা হয় D-গ্লুকোজ। ৫নং কার্বনে সংযুক্ত (-OH) মূলক বাম দিকে থাকলে তাকে বলা হয় L-গ্লুকোজ। D-গ্লুকোজ দক্ষিণাবর্ত (dextrorotatory) হয় যাকে d বা '+' চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়। L-গ্লুকোজ বামাবর্ত (laevorotatory) হয় যাকে *l* বা '−' চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়। দক্ষিণাবর্ত অর্থ হলো যৌগটি আলোক সক্রিয় এবং ঘূর্ণনের দিক 'ডান'; বামাবর্ত অর্থ হলো যৌগটি আলোক সক্রিয় এবং ঘূর্ণনের দিক 'বাম'। গ্লুকোজের d বা *l* ফর্ম optical rotation ছাড়া অন্যান্য সকল ভৌত বৈশিষ্ট্য একই প্রকার। উদ্ভিদে সব সময়ই D-গ্লুকোজ থাকে।

ফ্রুক্টোজ (Fructose) : গ্লুকোজের ন্যায় ফ্রুক্টোজও ৬ কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইড। এর আণবিক সংকেত $C_6H_{12}O_6$ (গ্লুকোজের মতোই)। এটিও একটি রিডিউসিং স্যুগার। এর গঠনে রয়েছে একটি কিটো গ্রুপ ($>C = O$)। একে কিটোহেক্সোজও বলা হয়। অধিকাংশ পাকা মিষ্টি ফল ও মধুতে ফ্রুক্টোজ থাকে। তাই এর আরেক নাম ফলের চিনি বা ফ্রুট স্যুগার (fruit sugar)। গ্লুকোজ থেকে সহজেই ফ্রুক্টোজ তৈরি হয় আবার সুক্রোজ হাইড্রোলাইসিস-এর ফলেও ফ্রুক্টোজ তৈরি হয়। এটি সুক্রোজ এর একটি গঠন উপাদান। গ্লুকোজের মতো ফ্রুক্টোজও D এবং L দু'প্রকার আছে। প্রথম ফ্রুট তথা ফল থেকে শনাক্ত করা হয়েছিল বলে নাম করা হয় ফ্রুক্টোজ। ফ্রুক্টোজ সমপরিমাণ গ্লুকোজের সাথে যুক্ত হয়ে চিনি গঠন করে। তাই একে বীট ও আখের কাণ্ড রসে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

D-ফ্রুক্টোজ (চেইন স্ট্রাকচার)

L-ফ্রুক্টোজ (চেইন স্ট্রাকচার)

α-D-ফ্রুক্টোজ (রিং স্ট্রাকচার)

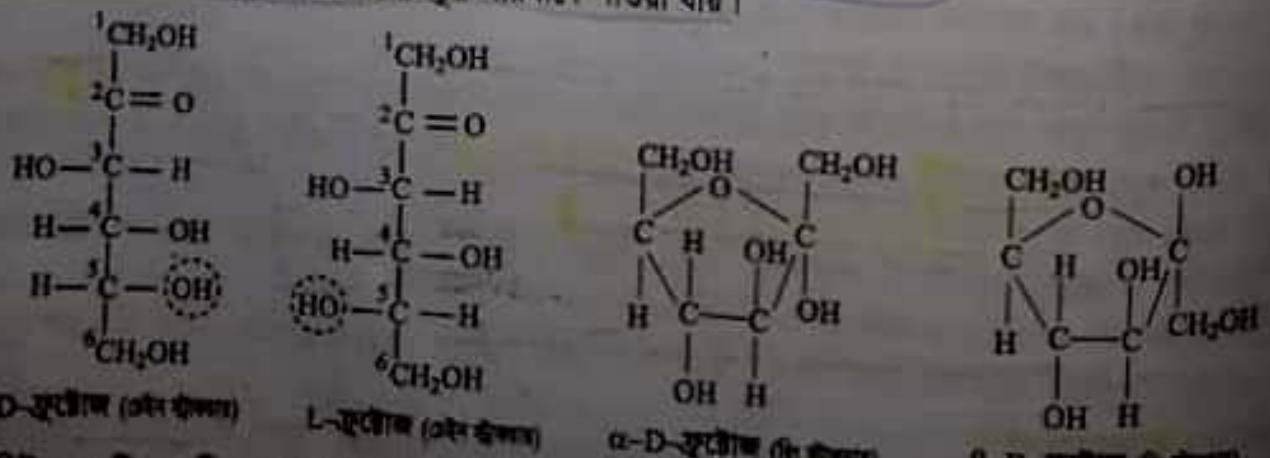

β-D-ফ্রুক্টোজ (রিং স্ট্রাকচার)

বৈশিষ্ট্য : এটি একটি সাদা বর্ণের, দানাদার, স্ফটিকাকার ও মিষ্টি জাতীয় পদার্থ। পানিতে সহজেই দ্রবণীয়, অ্যালকোহলে দ্রবণীয়। গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজের আণবিক সংকেত এক হলেও এদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। তাই এদেরকে আইসোমার বলে।

ব্যবহার। কনফেকশনারিতে নানা ধরনের মিষ্টান্ন জাতীয় জিনিস প্রস্তুত করার জন্য ফ্রুক্টোজ ব্যবহার করা হয়। সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ফ্রুক্টোজ তৈরি করে। সুক্রোজকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে সমপরিমাণে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ পাওয়া যায়।

গ্লুকোজ	ফ্রুক্টোজ
১। এটি একটি অ্যালডোহেক্সোজ কারণ এতে অ্যালডিহাইড গ্রুপ (-CHO) আছে।	১। এটি একটি কিটোহেক্সোজ কারণ এতে কিটো গ্রুপ (>C = O) আছে।
২। একে গ্রেইপ শ্যুগার বা আঙুরের শর্করা বলা হয়।	২। একে ফ্রুট শ্যুগার বলা হয়।
৩। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ উৎপন্ন হয়।	৩। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সরাসরি ফ্রুক্টোজ উৎপন্ন হয়।
৪। শ্বসনের প্রাথমিক পদার্থ হলো গ্লুকোজ।	৪। শ্বসনে গ্লুকোজ হতে ফ্রুক্টোজ উৎপন্ন হয়।
৫। এদের রিং স্ট্রাকচার পাইরানোজ ধরনের।	৫। এদের রিং স্ট্রাকচার ফিউরানোজ ধরনের।

- **ম্যানোজ (Mannose) :** ম্যানোজ একটি হেক্সোজ। এর আণবিক সংকেত $C_6H_{12}O_6$। এটি একটি অ্যালডোজ শ্যুগার।
- **গ্যালাক্টোজ (Galactose) :** গ্যালাক্টোজ আর একটি হেক্সোজ। এর আণবিক সংকেত $C_6H_{12}O_6$। এটিও একটি অ্যালডোজ শ্যুগার।

গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, ম্যানোজ, গ্যালাক্টোজ হলো গাঠনিক আইসোমার। এদের সবার গাঠনিক ফর্মুলা $C_6H_{12}O_6$ কিন্তু এদের পারমাণবিক বিন্যাস ভিন্ন।

আপেক্ষিক মিষ্টতা : সুকরোজ-১০০; গ্লুকোজ-৭৪; ফ্রুক্টোজ-১৭৩; মল্টোজ- ৩২; ল্যাক্টোজ- ১৬; স্যাকারিন- ৫০০; অ্যাসপারটিন- ২০০০।

(ঘ) **হেপ্টোজ (heptose, $C_7H_{14}O_7$):** সাত কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে বলা হয় হেপ্টোজ। সেডোহেপ্টোলোজ হলো একটি হেপ্টোজ শ্যুগার।

২। **ডাইস্যাকারাইড (Disaccharide) :** দুটি মনোস্যাকারাইড একত্রে যুক্ত হয়ে যে কার্বোহাইড্রেট গঠন করে তাকে ডাইস্যাকারাইড বলে। সুকরোজ, সেলোবায়োজ, ম্যালটোজ, ল্যাক্টোজ ইত্যাদি হলো উল্লেখযোগ্য ডাইস্যাকারাইড। ডাইস্যাকারাইডের সাধারণ সংকেত হলো $C_{12}H_{22}O_{11}$।

সুক্রোজ → গ্লুকোজ + ফ্রুক্টোজ, ম্যালটোজ → গ্লুকোজ + গ্লুকোজ, ল্যাকটোজ → গ্লুকোজ + গ্যালাক্টোজ

দুই অণু মনোস্যাকারাইডের মধ্যে ঘনীভবন বিক্রিয়ার ফলে দুটো -OH মূলক থেকে এক অণু পানি অপসারিত হলে ডাইস্যাকারাইড উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন ডাইস্যাকারাইড অণুতে উভয় মনোস্যাকারাইডের C-O-C নতুন বন্ধন সৃষ্টি করে। সৃষ্ট বন্ধনকে (–O–) **গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী** (Glycosidic bond) বলে।

সুক্রোজ-এর গঠন

(i) **সুকরোজ (Sucrose) :** উদ্ভিদের প্রধান ডাইস্যাকারাইড হলো সুকরোজ। এক অণু গ্লুকোজ এবং এক অণু ফ্রুক্টোজ এক সাথে সংযুক্ত হয়ে গঠন করে এক অণু সুকরোজ। এতে এক অণু পানি সৃষ্টি হয়ে বেরিয়ে যায়। চিনি হলো একটি সাধারণ সুকরোজ। ইক্ষু এবং বীট থেকে চিনি পাওয়া যায়। গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজ উভয়ই রিডিউসিং শ্যুগার, কিন্তু সুকরোজ রিডিউসিং শ্যুগার নয়। কারণ সুকরোজ তৈরির সময় দুটি মনোস্যাকারাইডের মুক্ত অ্যালডিহাইড ও কিটোন গ্রুপের অস্তিত্ব নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এর বিজারণ ক্ষমতা লুপ্ত হয়। সেজন্য এটিকে বিজারণ ক্ষমতাহীন

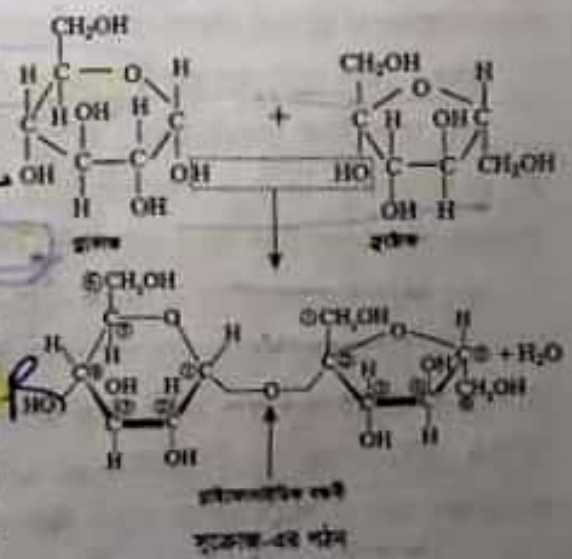

চিনি বলে। সুকরোজ তৈরির সময় দুটি মনোস্যাকারাইড তথা α-D-গ্লুকোজের ১নং কার্বনের –OH এবং β-D-ফ্রুক্টোজের ২নং কার্বনের –OH থেকে এক অণু পানি অপসারিত হয়। ফলে কার্বন দুটির মধ্যে একটি গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী বা অক্সিজেন ব্রিজ (–O–) গঠিত হয়ে সুকরোজ সৃষ্টি হয়। সবুজ উদ্ভিদের পাতায় প্রস্তুত কার্বোহাইড্রেট সুকরোজ হিসেবে বিভিন্ন অঙ্গে পরিবাহিত হয়। মধুর প্রধান কাঁচামাল হলো সুকরোজ। এর আণবিক সংকেত $C_{12}H_{22}O_{11}$।

উৎপাদন প্রণালি : ইক্ষুর রসে প্রায় ১৫% সুকরোজ, কিছু পরিমাণ জৈব অ্যাসিড, প্রোটিন ও ফসফেট জাতীয় পদার্থ বিদ্যমান। সংগৃহীত রসকে পরিস্রুত করার পর তার সাথে কলিচুন মিশানো হয়। তার ফলে দ্রবণ থেকে অ্যাসিড প্রশমিত হয়, ফসফেট অধঃক্ষিপ্ত হয় এবং চিনির আর্দ্র-বিশ্লেষণ বন্ধ হয়। অতঃপর রসকে উত্তপ্ত করলে বেশির ভাগ ভেজাল কেন অধঃক্ষেপ আকারে আলাদা হয়ে যায়। পরিস্রাবণ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত পরিষ্কার রসকে নিম্নচাপে ঘনীভূত করলে সুকরোজ এর স্ফটিক (চিনি) পাওয়া যায়।

বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম : সুকরোজ সাদা দানাদার, মিষ্টি স্বাদযুক্ত কঠিন পদার্থ। স্বাদে গ্লুকোজ থেকে দ্বিগুণ মিষ্টি, পানিতে দ্রবণীয়, কিন্তু বিশুদ্ধ অ্যালকোহল ও ইথারে অদ্রবণীয়। এর গলনাঙ্ক ১৮৮° সেলসিয়াস। লঘু অ্যাসিডে সুকরোজের জলীয় দ্রবণ আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে সমপরিমাণ গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ অণু গঠন করে।

$$\underset{\text{সুক্রোজ}}{C_{12}H_{22}O_{11}} + H_2O \xrightarrow{\text{আর্দ্রবিশ্লেষণ}} \underset{\text{গ্লুকোজ}}{C_6H_{12}O_6} + \underset{\text{ফ্রুক্টোজ}}{C_6H_{12}O_6}$$

কাজ : শ্বসনের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে শক্তি উৎপন্ন করে। কোষের বিভিন্ন উপাদান, বিশেষ করে পলিস্যাকারাইড সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়।

ব্যবহার : বিভিন্ন মিষ্টান্ন তৈরিতে ব্যবহার হয়। কনফেকশনারিতে ব্যবহৃত হয়। পরীক্ষাগারে অ্যালকোহল প্রস্তুতির জন্য ব্যবহৃত হয়। স্বচ্ছ সাবান তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

(ii) সেলোবায়োজ (Cellobiose) : দুই অণু β-D গ্লুকোজ β-1, 4 লিংকেজ দিয়ে সংযুক্ত হয়ে এক অণু সেলোবায়োজ তৈরি করে। কাজেই সেলোবায়োজ একটি ডাইস্যাকারাইড। সাধারণত সেলুলোজ বা লিগনিন-এর আংশিক ভাঙ্গনের ফলে সেলোবায়োজ তৈরি হয়। দুটি সদৃশ গ্লুকোজ অণু যুক্ত হয়ে এক অণু সেলোবায়োজ গঠিত হয়। এর আণবিক সংকেত $C_{12}H_{22}O_{11}$। সেলোবায়োজ একটি বিজারণক্ষম চিনি (রিডিউসিং শ্যুগার)। কোষ প্রাচীরের একটি গাঠনিক উপাদান সেলোবায়োজ। সেলুলোজকে আংশিকভাবে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একক (ইউনিট) গঠিত হয় তাদের মধ্যে অন্যতম যৌগ হলো সেলোবায়োজ। ইমালসিন এনজাইম ও অ্যাসিডের প্রভাবে সেলোবায়োজ ভেঙ্গে দুই অণু গ্লুকোজে পরিণত হয়। আবার ব্রোমিন পানি দিয়ে সেলোবায়োজকে জারিত করলে সেলোবায়োনিক অ্যাসিড তৈরি হয়।

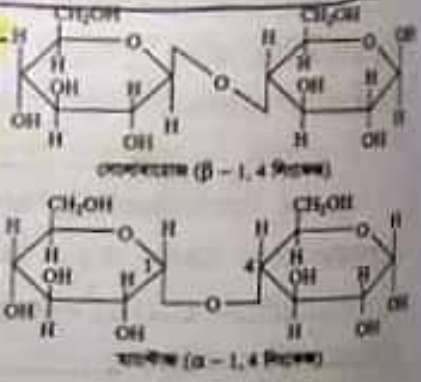

কাজ : কোষ প্রাচীরের একটি গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে।

(iii) ম্যালটোজ (Maltose) : ম্যালটোজ আর একটি ডাইস্যাকারাইড। দুই অণু α-D গ্লুকোজ α-1, 4 লিংকেজ দিয়ে সংযুক্ত হয়ে এক অণু ম্যালটোজ গঠন করে। সাধারণত স্টার্চ-এর আংশিক ভাঙ্গনের ফলে ম্যালটোজ তৈরি হয়। এটি আংশিক রিডিউসিং শ্যুগার। এর আণবিক সংকেত $C_{12}H_{22}O_{11}$।

৩। অলিগোস্যাকারাইড (Oligosaccharides) : যে সব কার্বোহাইড্রেটকে হাইড্রোলাইসিস করলে ৩ থেকে ১০টি মনোস্যাকারাইড অণু পাওয়া যায় তাদেরকে অলিগোস্যাকারাইড বলে (গ্রিক *oligo* = few বা স্বল্প, saccharin = sugar বা চিনি)। সাধারণত ৩ থেকে ১০টি মনোস্যাকারাইড এক একটি অলিগোস্যাকারাইড গঠন করে। একাধিক মনোস্যাকারাইড তাদের গ্লাইকোসাইডিক লিংকেজ (glycosidic linkage) দিয়ে পরস্পর সংযুক্ত থাকে। একটি মনোস্যাকারাইডের হাইড্রক্সিল গ্রুপের সাথে অপর একটি মনোস্যাকারাইডের হাইড্রক্সিল গ্রুপের সংযুক্তিকে গ্লাইকোসাইডিক লিংকেজ বলে।

...স্যাকারাইডগুলোকে তাদের মধ্যে বিদ্যমান মনোস্যাকারাইডের সংখ্যা দিয়ে শ্রেণিবিভাগ করা হয়; যেমন- তিনটি ...রাইড থাকলে ট্রাইস্যাকারাইড বলে, চারটি থাকলে টেট্রাস্যাকারাইড বলে ইত্যাদি।

• ট্রাইস্যাকারাইড : যে সকল অলিগোস্যাকারাইডকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে তিন অণু মনোস্যাকারাইড পাওয়া যায়। ...র‍্যাফিনোজ ($C_{18}H_{32}O_{16}$)। একে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে পাওয়া যাবে এক অণু গ্লুকোজ, এক অণু ফ্রুক্টোজ এবং এক ...গ্যালাক্টোজ।

$$\underset{\text{র‍্যাফিনোজ}}{C_{18}H_{32}O_{16}} + 2H_2O \xrightarrow{H^+} \underset{\text{গ্লুকোজ}}{C_6H_{12}O_6} + \underset{\text{ফ্রুক্টোজ}}{C_6H_{12}O_6} + \underset{\text{গ্যালাক্টোজ}}{C_6H_{12}O_6}$$

• টেট্রাস্যাকারাইড : যে সকল অলিগোস্যাকারাইডকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে চার অণু মনোস্যাকারাইড পাওয়া যায়। ...স্টাকিওজ (এটি ১ অণু গ্লুকোজ, ১ অণু ফ্রুক্টোজ ও ২ অণু গ্যালাক্টোজ নিয়ে গঠিত)।

...পলিস্যাকারাইড (Polysaccharides) : অনেকগুলো মনোস্যাকারাইড একত্রে পলিমারযুক্ত (polymerised) হয়ে ...পলিস্যাকারাইড (গ্রিক *Poly* = many)। অন্যভাবে বলা যায়, যে কার্বোহাইড্রেটকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে ...গো (দশের অধিক) মনোস্যাকারাইড অণু পাওয়া যায় তাকে পলিস্যাকারাইড বলে। এরা উচ্চ আণবিক ওজন (molecular weight) বিশিষ্ট জৈব রাসায়নিক পদার্থ। পলিস্যাকারাইড সাধারণত পানিতে অদ্রবণীয় এবং এরা মিষ্টি ...র্চ, সেলুলোজ, গ্লাইকোজেন ইত্যাদি হলো গুরুত্বপূর্ণ পলিস্যাকারাইড। সেলুলোজ প্রকৃতিতে সবচেয়ে বেশি পাওয়া ...র্চের পরিমাণ দ্বিতীয় পর্যায়ে। প্রকৃতিতে কাজের ভিত্তিতে পলিস্যাকারাইড দু'প্রকার :

... গাঠনিক পলিস্যাকারাইড : এরা জীবদেহে কাঠামো নির্মাণ বা গঠনের সাথে জড়িত থাকে। যেমন-সেলুলোজ, ...সেলুলোজ, পেকটিন প্রভৃতি উদ্ভিদের কোষপ্রাচীর গঠন করে।

... সঞ্চয়ী পলিস্যাকারাইড : এরা জীবদেহে সঞ্চিত বস্তু হিসেবে থাকে, যা পরে শক্তির উৎস হিসেবে ব্যয় হয়ে ... যেমন-স্টার্চ, গ্লাইকোজেন প্রভৃতি শ্বসন কার্যে ব্যবহৃত হয়।

...নে কয়েকটি পরিচিত পলিস্যাকারাইড-এর বর্ণনা দেয়া হলো।

$$\underset{\text{স্টার্চ}}{(C_6H_{10}O_5)_n} + \underset{\text{পানি}}{H_2O} \xrightarrow{\text{আর্দ্রবিশ্লেষণ}} \underset{\text{গ্লুকোজ (অনেক অণু)}}{C_6H_{12}O_6}$$

■ স্টার্চ (Starch) : অ্যামাইলোজ এবং অ্যামাইলোপেকটিন নামক ...পলিস্যাকারাইডের সমন্বয়ে গঠিত পদার্থই হলো স্টার্চ। উদ্ভিদে স্টার্চ ...রূপে) সঞ্চিত পদার্থরূপে বিরাজ করে। ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট ...র অধিকাংশই পরিবর্তিত হয়ে স্টার্চ-এ পরিণত হয়। স্টার্চ সাধারণত ঘনীভূত দানা হিসেবে (starch grain) উদ্ভিদ কোষে বিরাজ করে এবং এদের দানার আকার ও আকৃতি বিভিন্ন উদ্ভিদে বিভিন্ন রকম। বীজ, ফল, কন্দ (tuber) প্রভৃতি সঞ্চয়ী অঙ্গে স্টার্চ জমা থাকে। ধান, গম, আলু স্টার্চের প্রধান উৎস। সালোকসংশ্লেষণে তৈরি অধিকাংশ গ্লুকোজই স্টার্চে রূপান্তরিত হয়। বিভিন্ন স্টার্চের আকার-আকৃতিতে বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। আয়োডিন দ্রবণে স্টার্চ গাঢ় নীলবর্ণ ধারণ করে। স্টার্চ হাইড্রোলাইসিসের ফলে গ্লুকোজ-এ পরিণত হয়।

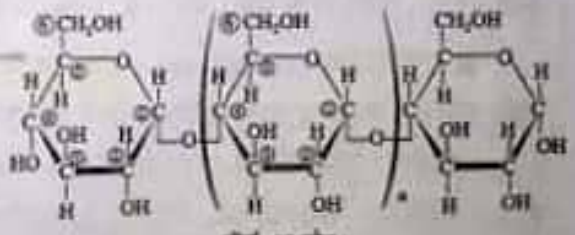

স্টার্চ-এর গঠন।

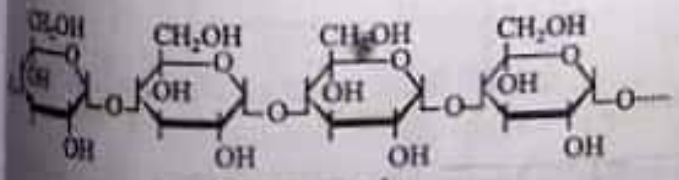

অ্যামাইলোজ-এর গঠন

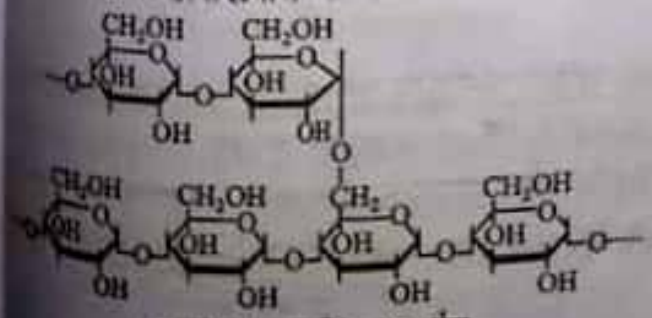

অ্যামাইলোপেকটিন-এর গঠন

অসংখ্য গ্লুকোজ অণু নিয়ে স্টার্চ গঠিত। অ্যামাইলোজের গ্লুকোজ অণুগুলো পরস্পর কার্বনের 1-4 স্থানে সংযুক্ত হয়। সাধারণত 200 থেকে 1000 গ্লুকোজ অণু নিয়ে একটি অ্যামাইলোজ তৈরি হয়। এর অণু-শৃঙ্খল অশাখান্বিত। অ্যামাইলোপেকটিন সাধারণত 2000 থেকে 2,00,000 গ্লুকোজ অণুবিশিষ্ট হয়। অ্যামাইলোপেকটিনের গ্লুকোজ অণুগুলো কার্বনের 1-4 বন্ধন ছাড়াও α-1-6 বন্ধনে যুক্ত থাকে। এর অণু-শৃঙ্খল শাখান্বিত। আলু, ধান, গম, ভুট্টা, যব ইত্যাদির স্টার্চে শতকরা ২২ ভাগ অ্যামাইলোজ এবং ৭৮ ভাগ অ্যামাইলোপেকটিন থাকে। অ্যামাইলোজ থাকায় স্টার্চের দ্রবণে আয়োডিন যোগ করলে কালবর্ণ (কাল-নীল) ধারণ করে। কিন্তু অ্যামাইলোপেকটিনের সাথে বিক্রিয়া করে আয়োডিন লাল বা পার্পল রং প্রদান করে। স্টার্চের আণবিক সংকেত $(C_6H_{10}O_5)_n$ স্টার্চের দীর্ঘ অণু বিভিন্ন আকৃতি ও আয়তনের দানা কণিকা গঠন করে থাকে। স্টার্চ আণুবীক্ষণিক এবং প্রজাতি বিশেষে কণিকার গঠনে পার্থক্য থাকে। যেমন- গোল আলু স্টার্চ কণিকা বৃহত্তম আর চালের স্টার্চ কণিকা ক্ষুদ্রতম। Hydrofilic পদার্থ

স্টার্চের ধর্ম (Properties of starch)

(i) স্টার্চ গন্ধহীন, বর্ণহীন, স্বাদহীন এবং সাদা পাউডার জাতীয় জৈব-রাসায়নিক পদার্থ।

(ii) সাধারণ তাপমাত্রায় স্টার্চ পানি, ইথার ও অ্যালকোহলে অদ্রবণীয়।

(iii) আয়োডিন দ্রবণে স্টার্চ নীল বর্ণ ধারণ করে।

(iv) উচ্চ তাপমাত্রায় স্টার্চ ভেঙ্গে ডেক্সট্রিন ও ম্যালটোজ হয়ে গ্লুকোজ-এ পরিণত হতে পারে।

(v) ফেলিং দ্রবণ স্টার্চ কর্তৃক বিজারিত হয় না।

কাজ : উদ্ভিদদেহে স্টার্চ প্রধানত সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে বিরাজ করে।

পরীক্ষা : আয়োডিন দ্রবণে স্টার্চ নীল বর্ণ ধারণ করে। কারণ স্টার্চের অ্যামাইলোজ উপাদান আয়োডিন অণুকে আবদ্ধ করে জটিল যৌগ গঠন করে। ফলে আয়োডিন পরমাণুগুলোর ইলেকট্রন অরবিটালের পরিবর্তন ঘটে এবং সূর্যালোক শোষণ করে নীল বর্ণ সৃষ্টি করে।

আর্দ্রবিশ্লেষণ : লঘু অ্যাসিড ও এনজাইম দ্বারা স্টার্চকে আর্দ্রবিশ্লেষিত করলে প্রথমে ডেক্সট্রিন, পরে ম্যালটোজ ও শেষে D-গ্লুকোজ উৎপন্ন হয়। যেমন- স্টার্চ $\xrightarrow{H_2O}$ ডেক্সট্রিন $\xrightarrow{H_2O}$ ম্যালটোজ $\xrightarrow{H_2O}$ D-গ্লুকোজ

স্টার্চের ব্যবহার (Uses of starch) : স্টার্চ প্রধানত খাদ্য হিসেবে গৃহীত হয়। অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানে যেমন–গ্লুকোজ, অ্যালকোহল ও চোলাই মদ তৈরিতে স্টার্চ ব্যবহৃত হয়। স্টার্চ গ্লুকোজে পরিণত হয়ে জীবদেহে শক্তি ও কার্বন অণু সরবরাহ করে থাকে। কাগজ ও আঠা প্রস্তুত করতেও স্টার্চ ব্যবহৃত হয়।

■ **সেলুলোজ (Cellulose) :** সেলুলোজ উদ্ভিদের একটি প্রধান গাঠনিক পদার্থ। উদ্ভিদের কোষ প্রাচীর সেলুলোজ দিয়ে গঠিত। অসংখ্য β-D গ্লুকোজ অণু পরস্পর β-1-4 কার্বন বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সেলুলোজ তৈরি করে। উদ্ভিদের অবকাঠামো নির্মাণে সেলুলোজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদ্ভিদদেহে যেহেতু কোনো কঙ্কাল নেই, সেহেতু উদ্ভিদের ভার বহনের দায়িত্ব পালন করে সেলুলোজ। তুলায় সেলুলোজের পরিমাণ ৯৪%, লিনেনে ৯০% এবং কাঠে ৬০%। তৃণলতায় ৩০-৪০% আর জৈব বস্তু সমৃদ্ধ মাটিতে ৪০-৭০% থাকে। সেলুলোজ ঘন H_2SO_4 বা HCl বা NaOH দ্বারা হাইড্রোলাইসিস করে গ্লুকোজে পরিণত করা যায়। মানুষের পরিপাক নালীর বিভিন্ন অংশে (মুখগহ্বর পাকস্থলী ও অন্ত্র) সেলুলেজ এনজাইম না থাকায় সেলুলোজ পদার্থ হজম হয় না; তবে সেলুলোজ গরু-ছাগলে পুষ্টি হিসেবে কাজ করতে পারে। বস্ত্র ও আসবাবপত্র শিল্পের প্রধান উপাদান সেলুলোজ, আর তাই মানব সভ্যতায় এর দান অপরিসীম। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ বিরাজ করে সেলুলোজ।

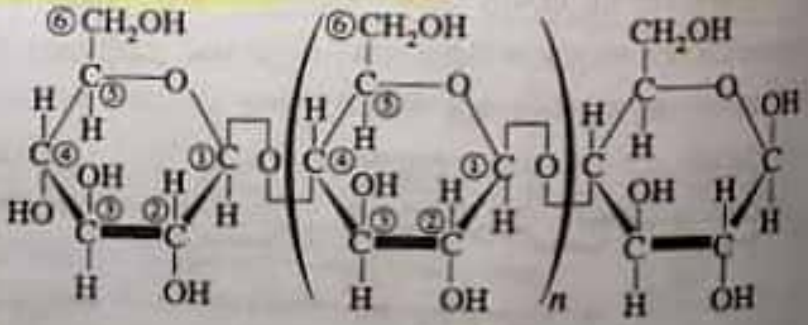

সেলুলোজ-এর গঠন।

সেলুলোজের ধর্ম : সেলুলোজ স্বাদহীন, গন্ধহীন, সাদা ও কঠিন জৈব-রাসায়নিক পদার্থ। এটি পানিতে অদ্রবণীয়, অবিজারক পদার্থ, আণবিক ভর দুই লক্ষ থেকে কয়েক লক্ষ। এটি মিষ্টি বিবর্জিত এবং বিজারণ ক্ষমতাহীন। আয়োডিন দ্রবণ প্রয়োগে কোনো রং দেয় না। এটি ফাইবার সদৃশ ও শক্ত।

সেলুলোজের কাজ : উদ্ভিদের গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে। উদ্ভিদকে দৃঢ়তা ও সুরক্ষা প্রদান করে এবং ভার বহন করে।

সেলুলোজের ব্যবহার : নিম্নে সেলুলোজের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

(i) সেলুলোজ দিয়ে তন্তু তৈরি হয়, যা বস্ত্রশিল্পের প্রধান কাঁচামাল।

(ii) এটি নাইট্রেট বিস্ফোরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

(iii) এটি অ্যাসিটেট ফটোগ্রাফিক ফিল্মে ব্যবহার করা হয়। ফিল্টার পেপার, টিস্যু পেপার, ফটোগ্রাফিক ফিল্ম, প্যাকেজিং এর দ্রব্যসমূহ সেলুলোজ দিয়ে তৈরি হয়।

(iv) নির্মাণ সামগ্রী ও আসবাবপত্র তৈরিতে সেলুলোজ প্রধান উপাদান হিসেবে যান্ত্রিক সাহায্য প্রদান করে থাকে।

(v) কাঠখেকো কীটপতঙ্গের পৌষ্টিকনালীতে বসবাসকারী এক ধরনের পরজীবী সেলুলেজ নামক উৎসেচক নিঃসৃত করে কাঠ হজমে সাহায্য করে।

(vi) থিন লেয়ার ক্রোমাটোগ্রাফিতে স্টেশনারি ফেজ হিসেবে সেলুলোজ ব্যবহৃত হয়।

(vii) ছত্রাক ও ব্যাক্টেরিয়া থেকে উৎপাদিত সেলুলোজ বর্তমানে বায়োটেকনোলজিতে ব্যবহৃত হচ্ছে।

(viii) গবাদি পশুর প্রধান খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

পার্থক্যের বিষয়	স্টার্চ	সেলুলোজ
১। গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন	স্টার্চ অণুতে প্রায় 1,200 থেকে 6,000 গ্লুকোজ একক α-গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে।	সেলুলোজে প্রায় 300 থেকে 3,000 গ্লুকোজ একক β-গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে।
২। পলিমারের গঠন	স্টার্চ অণু শাখান্বিত গ্লুকোজ পলিমার।	সেলুলোজ অণু অশাখান্বিত অর্থাৎ সরল শিকল পলিমার।
৩। সঞ্চিত খাদ্য	উদ্ভিদদেহে এটি সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে থাকে।	উদ্ভিদদেহে এটি গাঠনিক উপাদান হিসেবে থাকে।
৪। বর্ণ	আয়োডিনের সাথে বিক্রিয়া করে নীল বর্ণ প্রদান করে।	আয়োডিনের সাথে বিক্রিয়া করে কোনো বর্ণ প্রদান করে না।
৫। হজম	এটি গরু-ছাগল ও মানুষ হজম করতে পারে।	এটি গরু-ছাগল হজম করতে পারলেও মানুষ তা পারে না।

■ **গ্লাইকোজেন (Glycogen) :** গ্লাইকোজেন হলো একটি পুষ্টিজাত পলিস্যাকারাইড। এটি প্রাণিদেহের প্রধান সঞ্চিত খাদ্য উপাদান হলেও সায়ানোব্যাকটেরিয়া (নীলাভ সবুজ শৈবাল) ও কতিপয় ছত্রাকের (ঈস্ট) সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে বিরাজ করে। গ্লাইকোজেনের মূল গাঠনিক একক হলো α-D-গ্লুকোজ। অ্যামাইলোপেক্টিনের মতো এর অণু শৃঙ্খলও শাখান্বিত। α-1, 6 লিংকেজের মাধ্যমে শাখার সৃষ্টি হয়। প্রতি শাখায় সাধারণত ১০ থেকে ২০টি গ্লুকোজ অণু থাকে। হাইড্রোলাইসিস শেষে গ্লাইকোজেন হতে কেবল α-D-গ্লুকোজ অণু পাওয়া যায়। এর আণবিক সংকেত $(C_6H_{10}O_5)_n$। প্রাণিদেহের যকৃত (লিভার) ও মাংস পেশিতে বেশি করে গ্লাইকোজেন জমা থাকে যা প্রয়োজনে গ্লুকোজে পরিণত হয়ে কার্বন ও শক্তি সরবরাহ করে। এজন্য গ্লাইকোজেনকে প্রাণিজ স্টার্চ বলে।

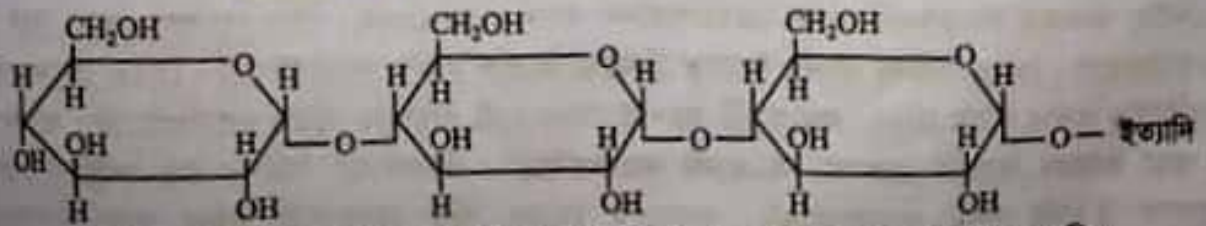

গ্লাইকোজেন অণুর একাংশ (α -1, 4 লিংকেজ)। চিত্রে α -1, 6 লিংকেজ শাখা দেখানো হয় নি।

গ্লাইকোজেনের ধর্ম (Properties of glycogen)

(i) গ্লাইকোজেন পানিতে আংশিক দ্রবণীয়। (ii) এটি সাদা পাউডার জাতীয় জৈব-রাসায়নিক পদার্থ। (ii) আয়োডিন দ্রবণ প্রয়োগে লালচে বেগুনি বর্ণ ধারণ করে। (iv) ঠাণ্ডা পানিতে এটি কলয়েড সাসপেনশন তৈরি করে। (v) তাপ দিলে এর লাল বর্ণ চলে যায়। (vi) ঠাণ্ডা অবস্থায় কালো বর্ণ ফিরে আসে। আংশিক আর্দ্র-বিশ্লেষিত হয়ে ম্যালটোজ, আর পূর্ণ আর্দ্র-বিশ্লেষিত হয়ে αD-গ্লুকোজ অণু প্রদান করে। (vii) গ্লাইকোজেন গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় আর্দ্র-বিশ্লেষিত হয়ে গ্লুকোজ অণু সৃষ্টি করে।

গ্লাইকোজেনের ব্যবহার (Uses of glycogen)

(i) পেশিতে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন পেশির কাজে শক্তি যোগায়। (ii) যকৃতে গ্লাইকোজেন ভেঙ্গে গ্লুকোজে পরিণত করে। (iii) এরা রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।

কাজ : সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে কাজ করে।

কাজ : গ্লুকোজ, সুক্রোজ এবং স্টার্চ এর গঠন ও কাজ শিক্ষার্থীদের একেক দল এক একটি উপস্থাপন করবে।

(গ) বিজারণ ক্ষমতার ভিত্তিতে : বিজারণ ক্ষমতার ভিত্তিতে কার্বোহাইড্রেট দু'প্রকার। যথা-

(i) রিডিউসিং শ্যুগার বা বিজারক শর্করা : যেসব কার্বোহাইড্রেটে কমপক্ষে একটি মুক্ত অ্যালডিহাইড (-CHO) বা কিটোন (=CO) গ্রুপ থাকায় ক্ষারীয় আয়নকে বিজারিত করতে পারে তাদেরকে রিডিউসিং শ্যুগার বা বিজারক শর্করা বলে। যেমন-গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ প্রভৃতি। এরা বেনেডিকটস বিকারক এবং ফেহলিং বিকারকের সাথে বিক্রিয়া করে।

(ii) নন-রিডিউসিং শ্যুগার বা অবিজারক শর্করা : যেসব কার্বোহাইড্রেটে একটিও মুক্ত অ্যালডিহাইড (-CHO) বা কিটোন (=CO) গ্রুপ না থাকায় ক্ষারীয় আয়নকে বিজারিত করতে পারে না তাদেরকে নন-রিডিউসিং শ্যুগার বা অবিজারক শর্করা বলে। যেমন সুক্রোজ, ট্রেহালোজ প্রভৃতি। সুক্রোজ α–D গ্লুকোজের ১ নং কার্বনের OH এবং β–D ফ্রুক্টোজের ২নং কার্বনের OH থেকে এক অণু পানি অপসারিত হয়ে একটি অক্সিজেন ব্রিজ (–O–) তৈরি হয়। এর ফলে এদের মুক্ত –CHO বা C=O গ্রুপ থাকে না। এদেরকে প্রাথমিক অবস্থায় আর্দ্রবিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়। এরপর অন্য যৌগকে বিজারিত করতে পারে।

□ **হেমিসেলুলোজ (Hemicellulose) :** উদ্ভিদের কোষ প্রাচীরে সেলুলোজ এবং পেকটিন পদার্থ ব্যতীত অন্যান্য পলিস্যাকারাইডকে হেমিসেলুলোজ বলে। যেমন- গ্লুকান, জাইলান ইত্যাদি।

□ **কাইটিন (Chitin) :** এটি নাইট্রোজেনবিশিষ্ট পলিস্যাকারাইড। এটি বিশ্বে প্রচুর পরিমাণে থাকা দ্রব্যের একটি। ছত্রাকের কোষ প্রাচীর এবং কাঁকড়া, লোবস্টার ইত্যাদির বহিঃকঙ্কালে কাইটিন থাকে।

কার্বোহাইড্রেট ডেরিভেটিভ্স (Carbohydrate derivatives)

মূল গঠনে রাসায়নিক পরিবর্তন বা কোনো কার্যকর গ্রুপ (functional group) যুক্ত হয়ে কিছু নতুন ধরনের কার্বোহাইড্রেটের উদ্ভব হয়। এরা হলো কার্বোহাইড্রেট ডেরিভেটিভ্স। ফ্রুক্টোজ এর OH গ্রুপের সাথে ফসফেট যুক্ত হয়ে ফ্রুক্টোজ ১, ৬-বিস ফসফেট (শ্যুগার ফসফেট) হয়ে থাকে (যা গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় ঘটে থাকে)। OH গ্রুপ অ্যামিনো ($-NH_2$) গ্রুপ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে গ্লুকোসামিন (Glucosamine), গ্যালাক্টোসামিন (Galactosamine) হয়ে থাকে। তরুণাস্থির প্রধান দ্রব্য গ্যালাক্টোসামিন। গ্লুকোসামিন পলিমার হয়ে তৈরি করে কাইটিন (Chitin) যা পতঙ্গ, কাঁকড়া-লোবস্টার এবং ছত্রাক কোষ প্রাচীরের গাঠনিক পলিস্যাকারাইড। কাইটিন পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণে থাকা দ্রব্যের একটি।

জীবদেহে কার্বোহাইড্রেট-এর ভূমিকা (Role of Carbohydrate)

যে কোনো জীবদেহ নিয়ন্ত্রণকারী প্রধান জৈবরাসায়নিক পদার্থ হলো DNA। কোষ বিভাজন থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রেই এর নিয়ন্ত্রণে। DNA গঠনের একটি উপাদান ডিঅক্সিরাইবোজ নামক কার্বোহাইড্রেট। DNA থেকে বার্তা নিয়ে জীবের বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটায় RNA, এর একটি গঠন উপাদান হলো রাইবোজ নামক কার্বোহাইড্রেট। শ্বসন প্রক্রিয়ার প্রাথমিক দ্রব্য হিসেবে ব্যবহৃত গ্লুকোজ, যা একটি কার্বোহাইড্রেট। জীবদেহের গাঠনিক বস্তু কাইটিন, সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ ইত্যাদি সবই কার্বোহাইড্রেট। আমাদের দেহের শক্তি প্রদানকারী প্রধান খাদ্য উপাদান হলো কার্বোহাইড্রেট। অর্থাৎ জীবদেহে কার্বোহাইড্রেট-এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অ্যামিনো অ্যাসিড (Amino Acids)

অ্যামিনো অ্যাসিড হলো প্রোটিনের মূল গাঠনিক একক। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী Emil Fischer ও Franz Hofmeister, 1902 খ্রিস্টাব্দে প্রোটিন অণুর গাঠনিক একক হিসেবে অ্যামিনো অ্যাসিড আবিষ্কার করেন। কোনো জৈব এসিডের এক বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু অ্যামিনো গ্রুপ ($-NH_2$) দ্বারা প্রতিস্থাপনের ফলে যে জৈব অ্যাসিড উৎপন্ন হয় তাকে অ্যামিনো অ্যাসিড বলা হয়। প্রতিটি অ্যামিনো অ্যাসিডে কমপক্ষে একটি অ্যামিনো গ্রুপ ($-NH_2$) এবং একটি কার্বক্সিল গ্রুপ ($-COOH$) থাকে। এতে অন্যান্য সক্রিয় কার্যকরী গ্রুপও থাকতে পারে। কাজেই অ্যামিনো অ্যাসিডের কার্যকরী গ্রুপ কী কী তার উপর নির্ভর করে সেই অ্যাসিডের গুণাবলি। উদ্ভিদদেহে বিভিন্ন প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিড আছে। এর মধ্যে বিশ প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিড বিভিন্নভাবে সমন্বিত ও সজ্জিত হয়ে বিভিন্ন রকম প্রোটিন তৈরি করে।

প্রোটিন গঠনকারী অ্যামিনো অ্যাসিডের সাধারণ গঠন

অ্যামিনো অ্যাসিড এর কার্বক্সিল গ্রুপ এর নিকটবর্তী কার্বন-পরমাণুটিকে α-কার্বন বলা হয় এবং কার্বক্সিল গ্রুপটি α-কার্বনের সাথে যুক্ত থাকলে তাকে α- অ্যামিনো অ্যাসিড বলা হয়।

অ্যামিনো অ্যাসিডের সাধারণ গঠন :

*R-গ্রুপ বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডে বিভিন্ন হয়

অ্যামিনো অ্যাসিডের রাসায়নিক গঠন : অ্যামিনো অ্যাসিডের সাধারণ রাসায়নিক সংকেত হলো $R-CH.NH_2.COOH$। এখানে R হলো একটি হাইড্রোজেন পরমাণু বা কার্বনযুক্ত কোনো জৈব যৌগ। অ্যামিনো অ্যাসিডে একটি অ্যামিনো গ্রুপ ($-NH_2$), একটি কার্বোক্সিল গ্রুপ ($-COOH$) এবং একটি পার্শ্বিক গ্রুপ (R) থাকে। তবে কোনো কোনো অ্যামিনো অ্যাসিডে ২টি অ্যামিনো গ্রুপ কিংবা ২টি কার্বোক্সিল গ্রুপ কিংবা সালফার থাকতে পারে। প্রকৃতিতে বেশির ভাগ অ্যামিনো অ্যাসিডই α-অ্যামিনো অ্যাসিড।

R-গ্রুপ H হলে গ্লাইসিন

α-কার্বনে সংযুক্ত R-গ্রুপ বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডে বিভিন্ন রকম হয়, যেমন-

R-গ্রুপ CH_3 হলে অ্যালানিন

R-গ্রুপ CH_2OH হলে অ্যামিনো অ্যাসিড সিরিন।

R-গ্রুপ CH_2SH হলে অ্যামিনো অ্যাসিড সিস্টিন।

অ্যামিনো অ্যাসিডের বৈশিষ্ট্য

১। মানবদেহে বিদ্যমান প্রায় সবগুলো অ্যামিনো অ্যাসিডই α-অ্যামিনো অ্যাসিড।
২। এরা পানিতে দ্রবণীয় কিন্তু অ্যালকোহলে অদ্রবণীয়।
৩। এরা স্বাদহীন, মিষ্টি বা তিক্ত পদার্থ।
৪। এরা বর্ণহীন, স্ফটিকাকার পদার্থ।
৫। মৃদু অ্যাসিড বা ক্ষারে অ্যামিনো অ্যাসিড লবণ সৃষ্টি করে।
৬। এরা উচ্চ গলনাঙ্কবিশিষ্ট।
৭। বিশুদ্ধ প্রোটিনকে কোনো রাসায়নিক পদার্থ কিংবা এনজাইম-এর সাহায্যে সম্পূর্ণ হাইড্রোলাইসিস করলে অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া যায়।
৮। এক বা একাধিক ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড পেপটাইড বন্ধনীর মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে প্রোটিন গঠন করে।
৯। অ্যাসিড ও ক্ষারবিশিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিডের মূলককে জুইটার আয়ন (Zuitter Ions; Zuitter = hybrid) বলে।

অ্যামিনো অ্যাসিডের শ্রেণিবিভাগ

উদ্ভিদ ও প্রাণী দেহ মিলে সর্বমোট ২৮টির মতো অ্যামিনো অ্যাসিড রয়েছে। এগুলোকে মোটামুটি ৩টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে; যথা-(১) অ্যালিফ্যাটিক অ্যামিনো অ্যাসিড, (২) অ্যারোমেটিক অ্যামিনো অ্যাসিড, (৩) হেটেরোসাইক্লিক অ্যামিনো অ্যাসিড।

১। অ্যালিফ্যাটিক অ্যামিনো অ্যাসিড : অ্যামিনো অ্যাসিডের পার্শ্বিকল গ্রুপটি (R-গ্রুপ) অ্যালিফ্যাটিক যৌগের হ... তাকে অ্যালিফ্যাটিক অ্যামিনো অ্যাসিড বলে। যেমন-গ্লাইসিন, অ্যালানিন, ভ্যালিন।

২। অ্যারোমেটিক অ্যামিনো অ্যাসিড : অ্যামিনো অ্যাসিডের পার্শ্বিকল গ্রুপটি (R-গ্রুপ) অ্যারোমেটিক যৌগের হ... তাকে অ্যারোমেটিক অ্যামিনো অ্যাসিড বলে। যেমন-ফিনাইল অ্যালানিন, টাইরোসিন।

৩। হেটেরোসাইক্লিক অ্যামিনো অ্যাসিড : অ্যামিনো অ্যাসিডে অ্যালিফ্যাটিক ও অ্যারোমেটিক অ্যামিনো অ্যাসিডের বিপরীত ধর্ম পরিলক্ষিত হলে তাকে হেটেরোসাইক্লিক অ্যামিনো অ্যাসিড বলে। যেমন-ট্রিপটোফ্যান, প্রোলিন, হিস্টিডিন।

সাধারণত ২০টি অ্যামিনো অ্যাসিড বিভিন্ন প্রোটিন গঠনে অংশগ্রহণ করে। এদেরকে বলা হয় প্রোটিন অ্যামিনো অ্যাসিড। এছাড়াও অনেক অ্যামিনো অ্যাসিড আছে যেগুলো প্রোটিন তৈরিতে অংশগ্রহণ করে না। এদেরকে বলা হয় নন-প্রোটিন অ্যামিনো অ্যাসিড। অরনিথিন (ornithine), সাইট্রুলিন (citruline), হেমোসেরিন (haemoserine) প্রভৃতি নন-প্রোটিন অ্যামিনো অ্যাসিড। এদের কিছু ইউরিয়া (যেমন-অরনিথিন) সংশ্লেষে বিশেষ ভূমিকা পালন করে; আবার কিছু (যেমন- হেমোসেরিন) প্রোটিন অ্যামিনো অ্যাসিড সংশ্লেষে ব্যবহৃত হয়। প্রোটিনে হাইড্রক্সিপ্রোপিনের উপস্থিতি খুব সীমিত। এটি বিরল অ্যামিনো অ্যাসিড।

বিশটি অ্যামিনো অ্যাসিড হলো : ১। লিউসিন, ২। আইসোলিউসিন, ৩। লাইসিন, ৪। মেথিওনিন, ৫। ভ্যালিন, ৬। সেরিন, ৭। প্রোলিন, ৮। থ্রিওনিন, ৯। অ্যালানিন, ১০। টাইরোসিন, ১১। হিস্টিডিন, ১২। অ্যাসপারাজিন, ১৩। সিস্টিন, ১৪। আরজিনিন, ১৫। গ্লাইসিন, ১৬। ট্রিপ্টোফ্যান, ১৭। গ্লুটামিন, ১৮। গ্লুটামিক অ্যাসিড, ১৯। অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড, ২০। ফিনাইল অ্যালানিন।

অ্যামিনো অ্যাসিডের কাজ : ১। প্রোটিন তৈরি তথা আমিষ সংশ্লেষণ করে। ২। জীবদেহ গঠনে ভূমিকা রাখে। ৩। কিছু ভিটামিন, এনজাইম, ইনডোল হরমোন অ্যান্টিবডি সংশ্লেষণে সাহায্য করে। ৪। ইউরিয়া সংশ্লেষণে সাহায্য করে। ৫। দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। ৬। দেহে pH নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। ৭। মেলানিন রঞ্জক সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

প্রোটিন (Protein) বা আমিষ

গ্রিক *'Proteios'* হতে Protein শব্দের উৎপত্তি। *'Proteios'* অর্থ হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রোটিন জীবদেহের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জৈব রাসায়নিক পদার্থ। বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড বিভিন্নভাবে শৃঙ্খলিত হয়ে এক একটি প্রোটিন গঠন করে। প্রোটিন শব্দটি প্রথম প্রয়োগ করেন জি. মুল্ডার (G. Mulder) ১৮৩৯ সালে।

প্রোটিন হলো অসংখ্য অ্যামিনো অ্যাসিড সমন্বয়ে গঠিত বৃহদাকার যৌগিক জৈব অণু। অন্যভাবে বলা যায়, প্রোটিন হলো উচ্চ আণবিক ওজনবিশিষ্ট বৃহৎ অণুর জৈব রাসায়নিক পদার্থ যা হাইড্রোলাইসিস প্রক্রিয়ায় অ্যামিনো অ্যাসিড উৎপন্ন করে। অর্থাৎ অ্যামিনো অ্যাসিডের পলিমারকে প্রোটিন বা আমিষ বলে। একটি কোষের অভ্যন্তরে সারাক্ষণ শত শত প্রকার প্রোটিন তৈরি হয়।

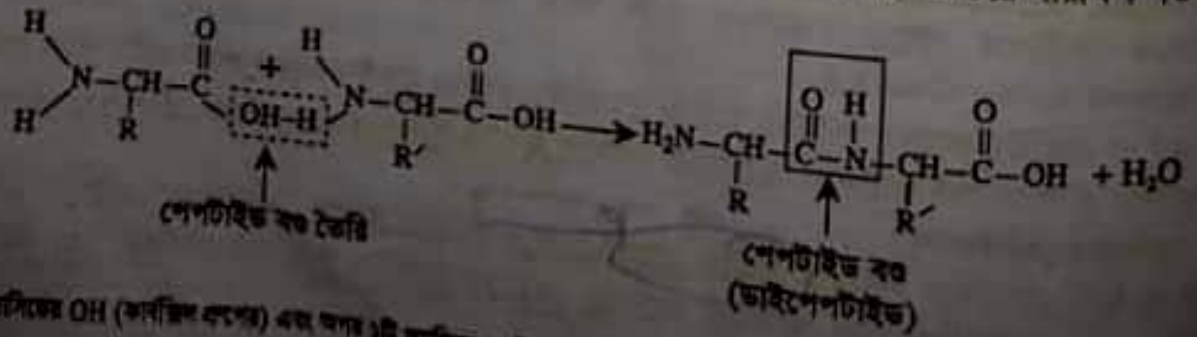

১টি অ্যামিনো অ্যাসিডের OH (কার্বক্সিল গ্রুপের) এবং অপর ১টি অ্যামিনো অ্যাসিডের H (অ্যামিনো গ্রুপের) যুক্ত হয়ে পানি বের হয়ে যায় এবং C–N বন্ধন তৈরি হয়।

বিস্তার : জীবদেহের প্রায় সর্বত্র প্রোটিন বিরাজমান। জীবদেহের সব অঙ্গে গাঠনিক বস্তু (structural elements) রূপে প্রোটিন বিদ্যমান। জৈব-ক্রিয়া-বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণকারী এনজাইম, অ্যান্টিবডি, হরমোন এগুলোও প্রোটিন। সব এনজাইমই প্রোটিন কিন্তু সব প্রোটিন এনজাইম নয়।

গঠন : বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড বিভিন্নভাবে শৃঙ্খলিত হয়ে এক একটি প্রোটিন গঠন করে। একটি অ্যামিনো অ্যাসিডের কার্বোক্সিল গ্রুপ (–COOH) অপর একটি অ্যামিনো অ্যাসিডের α-অ্যামাইনো গ্রুপের সাথে যুক্ত হয়ে যে বন্ড গঠন করে তাকে পেপটাইড বন্ড (peptide bond) বলে। প্রতিটি পেপটাইড বন্ড তৈরিতে এক অণু পানি নির্গত হয়। দুটি ভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড যুক্ত হয়ে গঠন করে ডাইপেপটাইড, তিনটি যুক্ত হয়ে গঠন করে ট্রাইপেপটাইড, চার থেকে দশটি সংযুক্ত হয়ে গঠন করে অলিগোপেপটাইড। বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডের প্রায় ৫০টি অণু পেপটাইড বন্ধন দ্বারা যুক্ত হয়ে পলিপেপটাইড সৃষ্টি করে। প্রোটিন হলো পলিপেপটাইড যৌগ।

প্রকৃতি : প্রতিটি জীবদেহে অসংখ্য ধরনের প্রোটিন থাকে। একটি জীবদেহে যতটি জিনের প্রকাশ ঘটে ঐ দেহে তত ধরনের প্রোটিন থাকে। কাজেই হাজার হাজার ধরনের প্রোটিন একটি জীবদেহে থাকতে পারে। আবার দুটি প্রজাতির মধ্যে যেহেতু জিনগত পার্থক্য থাকে, সেহেতু এদের মধ্যে প্রোটিনের ধরনগত পার্থক্যও থাকে। একই প্রজাতির দুটি জীবের জিনগত পার্থক্য থাকতে পারে, কাজেই একই প্রজাতির দুটি জীবের মধ্যেও প্রোটিনের কাঠামোগত পার্থক্য থাকবে।

সংশ্লেষণ স্থান : কোষস্থ রাইবোসোমে প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়।

প্রোটিনের বৈশিষ্ট্য

১। প্রোটিন কলয়েড প্রকৃতির, অধিকাংশ কেলাসিত।

২। প্রোটিনকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে অ্যাসিড, ক্ষার ও এনজাইম সহযোগে অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া যায়।

৩। বহুবিধ ভৌত ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রোটিনের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটানো যায়।

৪। প্রোটিন পানিতে, লঘু অ্যাসিডে, ক্ষার ও মৃদু লবণের দ্রবণে দ্রবণীয় কিন্তু অ্যালকোহলে অদ্রবণীয়।

৫। এটি কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন দিয়ে গঠিত। এছাড়াও এতে সালফার, আয়রন ও তামা থাকতে পারে।

৬। অ্যাসিড প্রয়োগ করলে প্রোটিন তঞ্চিত (জমাট বাঁধা) হয়। এতে আণবিক গঠন পরিবর্তিত হয়।

৭। প্রোটিন সাধারণত তড়িৎধর্মী ও বাফার দ্রবণ হিসেবে কাজ করে।

৮। প্রোটিনের মনোমার অ্যামিনো অ্যাসিডে ক্ষারীয় গ্রুপ ($-NH_2$) এবং অম্লীয় গ্রুপ (–COOH) থাকে বলে এটি একই সাথে ক্ষারীয় ও অম্লীয় উভয় গুণ প্রকাশ করে। এজন্য একে অ্যাম্ফোটেরিক (amphoteric) প্রোটিন বলে।

প্রোটিনের শ্রেণিবিভাগ (Types of Protein) : *Escherichia coli* এর একটি কোষে তিন হাজার ধরনের প্রোটিন আছে। মানুষের দেহে প্রায় এক লক্ষ ধরনের প্রোটিন আছে যা *E. coli* এর প্রোটিন থেকে আলাদা। প্রোটিনের বিশাল সংখ্যা শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি বিভিন্ন প্রকার।

(ক) জৈবিক কার্যাবলির ভিত্তিতে : জৈবিক কার্যাবলির ভিত্তিতে প্রোটিন দু'ধরনের; যথা–

(i) গাঠনিক প্রোটিন (Structural protein) : এরা জীবদেহের বিভিন্ন অংশ গঠন করে। কোষ এবং টিস্যুর গঠনকে দৃঢ় করে। এ ধরনের প্রোটিন ত্বক, চুল, শিং, ক্ষুর, অন্তঃকঙ্কাল (অস্থি ও তরুণাস্থি), যোজক টিস্যু ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ : কেরাটিন (ত্বক, শিং, নখ, ক্ষুর, পালক ইত্যাদি), কোলাজেন (অস্থি, টেনডন, যোজক টিস্যু ইত্যাদি), ফাইব্রোইন (সিল্ক ও মাকড়সার জাল), স্ক্লেরোটিন (পতঙ্গের বহিঃকঙ্কাল), কনড্রিন (তরুণাস্থিতে), ওসেইন (অস্থিতে)।

(ii) কার্যকরী প্রোটিন (Functional protein) : এরা জীবদেহে বিভিন্ন বিপাকীয় কাজে অংশগ্রহণ করে। এদেরকে ডায়নামিক বা রেগুলেটরি প্রোটিনও বলা হয়। যেমন- এনজাইম, হরমোন, ভিটামিন, শ্বাসরঞ্জক ইত্যাদি।

(খ) আকৃতি অনুযায়ী : আকৃতি অনুযায়ী প্রোটিন দু'ধরনের; যথা-

(i) তন্তুময় প্রোটিন (Fibrous protein) : যখন পলিপেপটাইডগুলো প্রোটিনে সমান্তরালভাবে একটি অক্ষ বরাবর সজ্জিত থাকে তখন তা লম্বা তন্তুর আকার ধারণ করে। এমন আকৃতির প্রোটিনকে তন্তুময় প্রোটিন বলে। যেমন- কেরাটিন, কোলাজেন, ফাইব্রাইন ইত্যাদি।

(ii) গ্লোবিউলার প্রোটিন (Globular protein) : যেসব প্রোটিনের গঠন গোলাকৃতির হয় তাদের গ্লোবিউলার প্রোটিন বলে। যেমন- মায়োগ্লোবিন, ইনসুলিন, হিমোগ্লোবিন ইত্যাদি।

(গ) গঠন অনুসারে প্রোটিন চার প্রকার, ১। প্রাইমারি ২। সেকেন্ডারি ৩। টারশিয়ারি এবং কুয়াটারনারি।

(ঘ) ভৌত-রাসায়নিক গুণাবলি ও দ্রবণীয়তার ভিত্তিতে : আধুনিক তথ্য অনুসারে ভৌত-রাসায়নিক গুণাবলি ও দ্রবণীয়তার ভিত্তিতে প্রোটিনকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- (১) সরল প্রোটিন, (২) যুগ্ম প্রোটিন ও (৩) উপ প্রোটিন।

১। সরল প্রোটিন (Simple protein) : যে প্রোটিনকে এনজাইম বা অ্যাসিড দিয়ে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে অ্যামিনো অ্যাসিড ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যায় না, তাকে সরল প্রোটিন বলে। দ্রবণীয়তার (solubility) ওপর ভিত্তি করে সরল প্রোটিনকে আবার ৭ ভাগে ভাগ করা হয়েছে; যথা :

(i) অ্যালবিউমিন (Albumin) : যে সব প্রোটিন পানিতে সহজে দ্রবীভূত হয়ে ঘোলাটে দ্রবণ সৃষ্টি করে, তাদের অ্যালবিউমিন বলে। এরা পানিতে এবং লঘু লবণ দ্রবণে দ্রবণীয়। তাপ দিলে এরা জমাট বাঁধে। যব ও বার্লি। অ্যামাইলোজ, ডিমের সাদা অংশে ওভালবুমিন (১০-১২%), রক্তরস ও লসিকার সিরাম–অ্যালবিউমিন (৪-৫%), দুধ ল্যাকটালবুমিন, গম বীজে লিউকোসিন, শিম বীজে লিগুমেলিন, মাংসপেশির মায়ো-অ্যালবিউমিন ইত্যাদি অ্যালবিউমিন প্রোটিনের উদাহরণ।

(ii) গ্লোবিউলিন (Globulins) : এ জাতীয় প্রোটিন পানিতে প্রায় অদ্রবণীয়, তবে লঘু লবণ দ্রবণে দ্রবণীয়। তাপে এরাও জমাট বাঁধে। বীজে এ ধরনের প্রোটিন বেশি থাকে। যেমন-ডিমের কুসুম (অভোগ্লোবিউলিন), রক্তরস (সিরাম গ্লোবিউলিন), চোখের লেন্স (ক্রিস্টালিন গ্লোবিউলিন), মাংসপেশি (মায়োসিন গ্লোবিউলিন) ইত্যাদি গ্লোবিউলিন প্রোটিনের উদাহরণ। শন, পাট, তুলা ইত্যাদি আঁশে এডেস্টিন, মটর বীজে লেগুলিন, চিনাবাদামে এরাচিন এবং আলুতে টিউবেরিন নামক উদ্ভিজ্জ গ্লোবিউলিন বিদ্যমান।

(iii) গ্লুটেলিন (Glutelins) : এরা পানি ও লবণে অদ্রবণীয়। লঘু অ্যাসিড বা লঘু ক্ষার দ্রবণে দ্রবণীয়। তাপে এরা জমাট বাঁধে না। শস্যদানায় এ জাতীয় প্রোটিন অধিক থাকে। গমের গ্লুটেনিন (glutenin) এবং চালের অরাইজেনিন (orygenin) গ্লুটেলিন প্রোটিনের উদাহরণ।

(iv) প্রোলামিন (Prolamins) : এরা পানি ও অ্যাবসলুট ইথানলে (১০০%) অদ্রবণীয়, কিন্তু ৭০-৮০% ইথানলে দ্রবণীয়। হাইড্রোলাইসিস শেষে যে প্রোটিন প্রচুর প্রোলিন ও অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করে তা প্রোলামিন। ভুট্টার জেইন (zein), গম ও রাইয়ের গ্লিয়াডিন (gliadin) এবং যব ও বার্লির হর্ডিন (hordein) প্রোলামিন প্রোটিনের উদাহরণ। এরা শুধু উদ্ভিদে থাকে। প্রোলামিন তাপে জমাট বাঁধে না।

(v) হিস্টোন (Histones) : এ জাতীয় প্রোটিন পানিতে দ্রবণীয়। এদের মধ্যে বেশি পরিমাণে ক্ষারীয় (basic) অ্যামিনো অ্যাসিড (যেমন- আরজিনিন, লাইসিন) থাকে। এরা তাপে জমাট বাঁধে না। এদেরকে নিউক্লিয়াসে এবং নিউক্লিক অ্যাসিডের সাথে বেশি দেখা যায়। উদাহরণ হিসেবে নিউক্লিয়োহিস্টোনের নাম বলা যায়।

(vi) প্রোটামিন (Protamines) : এরা সবচেয়ে ক্ষুদ্র প্রোটিন। প্রোটামিনগুলো পানি, লঘু অ্যাসিড এবং অ্যামোনিয়া হাইড্রক্সাইড-এ দ্রবণীয়। এতে ক্ষারীয় অ্যামিনো অ্যাসিড (যেমন- আরজিনিন) বেশি থাকে। এদেরকে নিউক্লিয়াসে পাওয়া যায় এবং নিউক্লিক অ্যাসিডের সাথেও দেখা যায়। প্রোটামিন-এ কোনো সালফার, টাইরোসিন, ট্রিপটোফ্যান থাকে না। এরা তাপে জমাট বাঁধে না। উদাহরণ : স্যামন মাছের শুক্রাণুতে সালমিন নামক প্রোটামিন থাকে।

(vii) স্ক্লেরোপ্রোটিন (Scleroproteins) : এরা পানি, মৃদু লবণ দ্রবণে দ্রবণীয় নয়। প্রাণিদেহের হাড়, চুল, নখ, ত্বক, পেশি টিস্যুতে এই প্রোটিন বেশি থাকে। যেমন-শিং, নখ, খুর ও চুলে কেরাটিন; চামড়ায় কোলাজেন ও হাড়ে টেনডন এ জাতীয় প্রোটিন।

২। যুগ্ম বা সংশ্লেষিত প্রোটিন (Conjugated proteins) : যে প্রোটিনের সাথে কোনো অপ্রোটিন অংশ (প্রোসথেটিক গ্রুপ = prosthetic group) যুক্ত থাকে তাকে বলা হয় কনজুগেটেড প্রোটিন বা যুগ্ম প্রোটিন। কনজুগেটেড প্রোটিনকে প্রধানত নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা হয়; যথা :

(i) নিউক্লিয়োপ্রোটিন (Nucleoproteins) : হাইড্রোলাইসিস করলে যে প্রোটিন থেকে একটি সরল প্রোটিন ও একটি নিউক্লিক অ্যাসিড পাওয়া যায় তা হলো নিউক্লিয়োপ্রোটিন। এরা পানিতে দ্রবণীয় এবং ক্রোমোসোমে পাওয়া যায়।

(ii) গ্লাইকোপ্রোটিন বা মিউকোপ্রোটিন (Glycoproteins or Mucoproteins) : প্রোটিনের সাথে বিভিন্ন ধরনের কার্বোহাইড্রেট (বিশেষ করে মনোস্যাকারাইড) যুক্ত হলে তাকে গ্লাইকোপ্রোটিন বা মিউকোপ্রোটিন বলে। সেলমেমব্রেন-এ গ্লাইকোপ্রোটিন পাওয়া যায়।

(iii) লিপোপ্রোটিন (Lipoproteins) : এটি লিপিড ও সরল প্রোটিনের সমন্বয়ে গঠিত একটি জৈব রাসায়নিক পদার্থ। এর লিপিড অংশ গঠিত হয় কোলেস্টেরল ও ফসফোলিপিড দিয়ে। লিপিড সরল প্রোটিন অণুর সাথে সংযুক্ত থাকে। বিভিন্ন অঙ্গাণুর (নিউক্লিয়াস, মাইটোকন্ড্রিয়া, ক্লোরোপ্লাস্টের ল্যামিলী, ETC) গাঠনিক উপাদান হিসাবে এরা বিরাজ করে। মানুষের রক্তের প্লাজমা প্রোটিনও লিপোপ্রোটিন জাতীয়। লিপোপ্রোটিন পানিতে দ্রবণীয়।

কাজ : গাঠনিক উপাদান হিসেবে বিভিন্ন মেমব্রেন গঠনে পূর্ণতা দান।

(iv) ক্রোমোপ্রোটিন (Chromoproteins) : সরল প্রোটিনে রঞ্জক পদার্থ যুক্ত হয়ে ক্রোমোপ্রোটিন সৃষ্টি করে। সাইটোক্রোম প্রোটিন, বিলিপ্রোটিন, ক্যারোটিনয়েড প্রোটিন, ক্লোরোফিল প্রোটিন, হিমোগ্লোবিন প্রোটিন ইত্যাদি হলো ক্রোমোপ্রোটিন।

(v) মেটালোপ্রোটিন (Metaloproteins) : অনেক এনজাইমে অ্যাক্টিভেটর হিসেবে কোনো ধাতু বা মেটাল (Fe, Mn, Mg, Zn) থাকে। ধাতু বা মেটাল সম্বলিত এনজাইমগুলো হলো মেটালোপ্রোটিন। যেমন-সিডারোফিলিন ও সেলোপ্লাজিমিন।

(vi) ফসফোপ্রোটিন (Phosphoproteins) : যে সকল প্রোটিনের সাথে প্রোসথেটিক গ্রুপ হিসেবে ফসফোরিক এসিড যুক্ত থাকে তাকে ফসফোপ্রোটিন বলে। দুধের কেসিনোজেন, ডিমের ভাইটেলিন এ জাতীয় প্রোটিন।

(vii) ফ্ল্যাভোপ্রোটিন (Flavoprotiens) : এ ধরনের প্রোটিনগুলো ফ্ল্যাভিন যৌগ তথা FAD (Flavin Adenine Dinucleotide) এর সাথে যুক্ত অবস্থায় থাকে।

(viii) লৌহ-পোরফাইরিন প্রোটিন (Iron-porphyrin proteins) : এ ধরনের প্রোটিন Iron-porphyrin যৌগ তথা সাইটোক্রোম এর সাথে যুক্ত থাকে।

৩। উদ্ভূত বা উৎপাদিত প্রোটিন (Derived proteins) : এসব প্রোটিন প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় থাকে না। তাদের উপর এনজাইমের বা রাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় অথবা কৃত্রিম উপায়ে প্রোটিন অণু থেকে তৈরি হয়। উদাহরণ-পেপটাইড (Peptides), প্রোটিয়োজ (Proteoses), পেপটোন (Peptone) ইত্যাদি। যেমন-মায়োসিন থেকে মায়োসান সৃষ্টি এবং অ্যালবুমিন থেকে অ্যালবুসোম সৃষ্টি হয়।

আবার গুণগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রোটিন দু'প্রকার : (i) প্রথম শ্রেণির প্রোটিন ও (ii) দ্বিতীয় শ্রেণির প্রোটিন।

(i) প্রথম শ্রেণির প্রোটিন : যেসব প্রোটিনে সবকয়টি অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে তাদের প্রথম শ্রেণির প্রোটিন (সম্পূর্ণ প্রোটিন) বলে। যেমন-মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, বাদাম, সয়াবিনসহ অধিকাংশ প্রাণিজ প্রোটিন।

(ii) দ্বিতীয় শ্রেণির প্রোটিন : যেসব প্রোটিনে সবগুলো অপরিহার্য অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে না এদের দ্বিতীয় শ্রেণির প্রোটিন বলে। যেমন-সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সকল উদ্ভিদ প্রোটিন।

প্রোটিনের রাসায়নিক উপাদান : বিশ প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিডই প্রোটিনের প্রধান রাসায়নিক উপাদান। এছাড়া প্রোটিনে প্রোসথেটিক গ্রুপ হিসেবে লিপিড, কার্বোহাইড্রেট, নিউক্লিক অ্যাসিড ইত্যাদি থাকে।

প্রোটিনের কাজ

১। জীবদেহের গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে।

২। কোষে প্রোটিন সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে কাজ করে এবং প্রয়োজনে শক্তি উৎপাদন করে।

৩। বিভিন্ন অঙ্গাণু এবং কোষ ঝিল্লি গঠনে কাজ করে।

৪। এনজাইম হিসেবে জীবদেহের ক্রিয়া-বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে তথা জীবদেহকে সচল রাখে।

৫। এ্যান্টিবডির গাঠনিক উপাদান হিসেবে দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করে এবং দেহকে রোগমুক্ত রাখে।

৬। জীবদেহের প্রয়োজনীয় হরমোন উৎপন্ন করে।

৭। হিস্টোন প্রোটিন নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিক অ্যাসিডকে কার্যকর করে।

৮। কিছু প্রোটিন বিষাক্ত হওয়ায় অনেক জীব তা খেয়ে মারা যায় (সাপের বিষের প্রোটিন)।

৮। যে সকল উদ্ভিদে বিষাক্ত প্রোটিন থাকে তারা অনেক পশু পাখির আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়।

১০। হিমোগ্লোবিন প্রোটিন প্রাণিদেহের সমস্ত কোষে O_2 ও CO_2 পরিবহন করে।

১১। মানবদেহের পেপটাইড থেকে উৎপাদিত প্রোটিন ডিফেনসিভ (defensive) এন্টিবডি হিসেবে কাজ করে।

১২। ইন্টারফেরন (interferon) একটি কোষীয় প্রোটিন। এটি ভাইরাস আক্রমণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেহে তৈরি হ… ধারণা করা হচ্ছে ইন্টারফেরন ক্যান্সার ও ভাইরাসজনিত রোগ নিরাময়ে ব্যবহার করা যাবে।

জীবদেহে প্রোটিনের ভূমিকা (Role of Protein)

জীবদেহে প্রোটিনের ভূমিকা অত্যাবশ্যকীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এটি দেহের গঠন উপাদানের একটি বড় অংশ। প্রোটি… ছাড়া দেহাঙ্গ বা অঙ্গাণুর সঠিক গঠন সম্ভব নয়। সজীব দেহ কতগুলো রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার সমষ্টিমাত্র। আর এ… ক্রিয়া-বিক্রিয়া এনজাইম কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। সব এনজাইমই প্রোটিন। 'জিন'-এর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ ঘটে প্রোটিনের মধ্যে… আর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ ছাড়া জীবের অস্তিত্ব নেই। জীবদেহের বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন হরমোন বিশেষ বিশেষ ভূমি… পালন করে থাকে (যেমন ইনস্যুলিন, হিমোগ্লোবিন)। অধিকাংশ হরমোনই প্রোটিন। দেহের ইমিউন সিস্টে… প্রোটিননির্ভর। প্রোটিন দেহের শক্তির উৎস হিসেবেও কাজ করে। কোষচক্র সম্পন্ন করতেও প্রোটিনের প্রয়োজন হ… ট্রান্সক্রিপশন সম্পন্ন করতেও প্রোটিনের প্রয়োজন হয়।

বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার এর কারণ হিসেবে ভাইরাস চিহ্নিত হয়েছে। ইন্টারফেরন নামক বিশেষ প্রোটিন ভাইরা… প্রতিরোধক হিসেবে ব্লাড ক্যান্সার নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। রোগ জীবাণু ধ্বংস ও নিয়ন্ত্রণের জন্য পোষক দেহে যে অ্যান্টি… তৈরি হয় তা সংশ্লেষ করতে প্রোটিন এর প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন জীবের বিপাকীয় বিক্রিয়ায় প্রোটিন থেকে বিষাক্ত প… উৎপন্ন হয়। এসব পদার্থ জীবের আত্মরক্ষার জন্য বিশেষ সহায়ক। যেমন-সাপের বিষ। মস্তিষ্কে উৎপন্ন এবং… ব্যথানাশক হিসেবে অতি সম্প্রতি আবিষ্কৃত ঘুম আনয়নকারী s-factor বিশেষ ধরনের প্রোটিন বলে প্রমাণিত হয়েছে।

খাদ্য তালিকায় প্রোটিন

আমাদের খাদ্য তালিকায় প্রোটিন জাতীয় খাবার রাখা পরিহার্য, কারণ শরীর গঠনে প্রোটিনের ভূমিকা মুখ্য। বিভি… প্রকার খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ বিভিন্ন রকম। পরিমাণের দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি প্রোটিন থাকে বিভিন্ন ডাল জাতী… খাবারে কিন্তু এর পরও পুষ্টিবিজ্ঞানীগণ প্রাণিজ প্রোটিনকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

প্রোটিন তৈরি হয় বিশ প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে। গাঠনিক ইউনিট হিসেবে এই বিশ প্রকার অ্যামিনো অ্যাসি… অত্যাবশ্যকীয়। মানবদেহের চাহিদা অনুসারে মাত্র আটটি অ্যামিনো অ্যাসিড (লিউসিন, আইসোলিউসিন, লাইসিন… মেথিওনিন, থিওনিন, ভ্যালিন, ফিনাইল অ্যালানিন এবং ট্রিপ্টোফ্যান)কে অত্যাবশ্যকীয় (essential) অ্যামিনো অ্যাসিড…

এর কারণ হলো অন্য ১২টি অ্যামিনো অ্যাসিড আমাদের দেহাভ্যন্তরে সংশ্লেষিত হতে পারে কিন্তু উক্ত ৮টি অ্যামিনো দেহাভ্যন্তরে সংশ্লেষিত হয় না, খাদ্যের মাধ্যমে দেহে গ্রহণ করা হয়। শিশুদের জন্য অরজিনিন এবং হিস্টিডিন প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ শিশুদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিড ১০টি।

সব প্রোটিনে সব অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে না, তাই যে সব প্রোটিনে সবকটি অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে তালিকায় সেগুলোই প্রাধান্য দেয়া উচিত। এদিক থেকে প্রাণিজ প্রোটিনই (মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদি) অগ্রগামী (১০০) এবং উদ্ভিজ্জ প্রোটিন (যেমন ডাল) অনুগামী।

প্রকৃতপক্ষে প্রোটিনের মান বিচারে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিডসমূহের উপস্থিতিই প্রধান বিবেচ্য বিষয় নয়। প্রয়োজনীয় ৮টি অ্যামিনো অ্যাসিডের একটিও যদি মিনিমাম আদর্শ পরিমাণের চেয়ে কম থাকে তা হলেই এর মান কমে যায়। কারণ দেহ সঠিক পরিমাণে তা শোষণ করতে পারে না। মানের দিক থেকে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন পিছনে থাকার এটিই কারণ। আদর্শ প্রোটিন পাওয়া যায় ডিম এবং দুধে। তাই এ দুটি আদর্শ খাবার। চালের প্রোটিন এবং ডালের প্রোটিন এক সাথে একটির অভাব অপরটি কিছুটা পূরণ করে, তাই চাল-ডালের খিচুড়ির পুষ্টিমান ভাত এবং ডালের চেয়ে উপরে।

আদর্শ প্রোটিন : প্রতি ১০০ গ্রাম আদর্শ প্রোটিনে অ্যামিনো অ্যাসিডের পরিমাণ (গ্রাম)

	আইসোলিউসিন	লিউসিন	লাইসিন	ফিনাইল অ্যালানিন	মেথিওনিন	থ্রিওনিন	ট্রিপ্টোফ্যান	ভ্যালিন
আদর্শ প্রোটিন	৪.৩	৪.৯	৪.৩	২.৯	২.৩	২.৯	১.৪	৪.৩
ডিম	৬.৮	৯.০	৬.৩	৬.০	৩.১	৫.০	১.৭	৭.৪
দুধ	৬.৪	৯.৯	৭.৮	৪.৯	২.৪	৪.৬	১.৪	৬.৯
ডাল	৫.২	৬.৯	৬.১	৪.১	০.৬	৩.৬	০.৮	৫.৫
মাছ	৬.৫	৯.৫	৯.০	৪.৪	৩.২	৪.৭	১.২	৬.০
মাংস	৫.২	৭.৮	৮.৬	৩.৯	২.৭	৪.৪	১.০	৫.১

ডিম এবং দুধ আদর্শ প্রোটিন। মাছ-মাংসে ট্রিপ্টোফ্যান আদর্শ মাত্রার চেয়ে কম। ডালে মেথিওনিন ও ট্রিপ্টোফ্যান আদর্শ মাত্রার চেয়ে কম। কাজেই মাছ-মাংস প্রকৃত আদর্শ প্রোটিন নয়। ডালের প্রোটিন আরো নিম্নমানের।

লিপিড (Lipids) বা স্নেহজাতীয় পদার্থ

উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে বিদ্যমান একটি গুরুত্বপূর্ণ জৈব রাসায়নিক পদার্থের নাম লিপিড। কার্বোহাইড্রেটের মতো এরাও কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নিয়ে গঠিত হয়। উদ্ভিদদেহে বিশেষ করে ফল ও বীজে অধিক পরিমাণ লিপিড থাকে। কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সমন্বয়ে গঠিত স্নেহজাতীয় পদার্থকে লিপিড বলা হয়। অন্যভাবে, রাসায়নিকভাবে অ্যালকোহল ও ফ্যাটি অ্যাসিডের এস্টারকে লিপিড বলে। লিপিড প্রধানত স্নেহ ও তেলরূপে বিদ্যমান থাকে। সাধারণ তাপমাত্রায় কতিপয় লিপিড শক্ত থাকে এবং ২০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কতিপয় লিপিড তরল থাকে। শক্ত ও কঠিন লিপিডকে স্নেহ বা চর্বি (fat) এবং তরল লিপিডকে তেল (oil) বলা হয়। লিপিডের নির্দিষ্ট কোনো গলনাঙ্ক নেই।

লিপিডের বৈশিষ্ট্য

1. লিপিড পানিতে প্রায় অদ্রবণীয়।
2. এরা ইথার, অ্যালকোহল, বেনজিন, ক্লোরোফর্ম, অ্যাসিটোন, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি দ্রবণে দ্রবণীয়।
3. এরা ফ্যাটি অ্যাসিডের এস্টার হিসেবে (actual or potential) বিরাজ করে।
4. লিপিড পানির চেয়ে হালকা; তাই পানিতে ভাসে।
5. হাইড্রোলাইসিস শেষে এরা ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারোলে পরিণত হয়।
6. লিপিডের আণবিক ওজন বৃদ্ধির সাথে সাথে গলনাঙ্ক বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

৭। লিপিডের সাথে Sudan III দ্রবণ যোগ করলে লাল বর্ণ ধারণ করে।

৮। সাধারণ উষ্ণতায় (20°C) কিছু লিপিড (যেমন-তেল) তরল এবং কিছু লিপিড (যেমন চর্বি) কঠিন অবস্থায় থাকে।

লিপিড-এর গঠন

সাধারণভাবে গ্লিসারোল ও ফ্যাটি অ্যাসিডের সমন্বয়ে লিপিড গঠিত হয়। ফসফোলিপিড-এ গ্লিসারোল ও ফ্যাটি অ্যাসিড ছাড়া ফসফরাস এবং নাইট্রোজেন বেস থাকে। গ্লাইকোলিপিড-এ ফ্যাটি অ্যাসিড, শ্যুগার (হেক্সোজ) নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থ থাকে। মোমজাতীয় লিপিড-এ গ্লিসারোল-এর পরিবর্তে অ্যালকোহল বা কোলেস্টেরোল থাকে।

লিপিড-এর কাজ

১। চর্বি ও তেল জাতীয় লিপিড উদ্ভিদদেহে সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে জমা থাকে। বিভিন্ন তেলবীজের (সরিষা, তিল, সয়াবিন ইত্যাদি) অঙ্কুরোদগমকালে লিপিড খাদ্যরূপে গৃহীত হয়। এদের বিজারণকালে অধিক ATP তৈরি হয়।

২। ফসফোলিপিড বিভিন্ন মেমব্রেন গঠনে উপাদান হিসেবে কাজ করে।

৩। মোম জাতীয় লিপিড পাতার বহিরাবরণে স্তর (কিউটিকল) সৃষ্টি করে অতিরিক্ত প্রস্বেদন রোধ করে।

৪। কতিপয় এনজাইমের প্রোসথেটিক গ্রুপ হিসেবে ফসফোলিপিড কাজ করে। এছাড়া ফসফোলিপিড আয়ন বাহক হিসেবেও কাজ করে।

৫। সালোকসংশ্লেষণে গ্লাইকোলিপিড বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৬। প্রোটিনের সাথে যুক্ত হয়ে লিপোপ্রোটিন গঠন করে এবং লিপোপ্রোটিন শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত থাকে।

লিপিড-এর শ্রেণিবিভাগ (Classification of Lipids)

(ক) রাসায়নিক গঠন প্রকৃতি অনুসারে লিপিড প্রধানত তিন প্রকার; (Bloor 1943) যথা-

১। সরল লিপিড, যেমন- চর্বি, তেল, মোম ইত্যাদি;

২। যৌগিক লিপিড, যেমন- ফসফোলিপিড, গ্লাইকোলিপিড, সালফোলিপিড ইত্যাদি;

৩। উদ্ভূত বা উৎপাদিত লিপিড, যেমন- স্টেরয়েড, টারপিনস, রাবার ইত্যাদি।

(খ) আণবিক গঠন অনুযায়ী লিপিড প্রধানত পাঁচ প্রকার; যথা-

(i) নিউট্রাল লিপিড, (ii) ফসফোলিপিড, (iii) গ্লাইকোলিপিড, (vi) টারপিনয়েডস এবং (v) মোম।

নিচে কয়েক প্রকার লিপিডের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেয়া হলো :

১। সরল লিপিড (Simple lipids) : যেসব লিপিডের বিশ্লেষণে স্নেহ পদার্থ ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যায় না তাকে সরল লিপিড বলে। সরল লিপিড দু প্রকার : (i) স্নেহদ্রব্য (চর্বি ও তেল) ও (ii) মোম।

(i) স্নেহদ্রব্য (চর্বি ও তেল) : ফ্যাটি অ্যাসিডের গ্লিসারোল এস্টারকে বলা হয় স্নেহদ্রব্য। এতে তিন অণু ফ্যাটি অ্যাসিডের সাথে এক অণু গ্লিসারোল যুক্ত হয়। একে ট্রাইগ্লিসারাইড বা নিউট্রাল লিপিডও বলা হয়। ট্রাইগ্লিসারাইড দু'রকম; যথা- চর্বি ও তেল।

চর্বি (Fat) : যে সব ট্রাইগ্লিসারাইড সম্পৃক্ত (saturated) ফ্যাটি অ্যাসিড দিয়ে তৈরি এবং সাধারণ তাপমাত্রায় (২০° সে.) কঠিন বা অর্ধকঠিন অবস্থায় বিরাজ করে তাকে চর্বি বলে। যেমন- উদ্ভিজ্জ চর্বি ও পাম অয়েল। এর গলনাঙ্ক বেশি। নারিকেল তেলও চর্বি জাতীয়, নিম্ন তাপমাত্রায় জমাট বাঁধে।

তেল (Oil) : যে সব ট্রাইগ্লিসারাইড অসম্পৃক্ত (unsaturated) ফ্যাটি অ্যাসিড দিয়ে তৈরি এবং সাধারণ তাপমাত্রায় (২০° সে.) তরল অবস্থায় থাকে তাকে তেল বলে। যেমন- সাধারণ ভোজ্য তেল। এর গলনাঙ্ক খুব কম।

চর্বি ও তেলের কাজ : ১। ফল ও বীজে সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে জমা থাকে। ২। বীজের অঙ্কুরোদগমকালে কার্বোহাইড্রেট-এ পরিবর্তিত হয়ে বর্ধিষ্ণু চারার খাদ্য ও শক্তি যোগায়।

ট্রাইগ্লিসারাইড (Triglyceride)

এক অণু গ্লিসারোল-এর সাথে তিনটি ফ্যাটি অ্যাসিড সংযুক্ত হয়ে তৈরি হয় এক অণু ট্রাইগ্লিসারাইড। এ সময় তিন অণু পানি তৈরি হয়, কাজেই এটি হলো একটি ডিহাইড্রেশন বিক্রিয়া। গ্লিসারোল হলো একটি ক্ষুদ্র অণুর অ্যালকোহল

যেখানে ৩টি কার্বন ও ৩টি হাইড্রোক্সি পার্শ্বগ্রুপ থাকে। ফ্যাটি অ্যাসিড হলো একটি হাইড্রোকার্বন চেইন যার মাথায় একটি কার্বোক্সিল গ্রুপ থাকে। কার্বোক্সিল গ্রুপের ডিহাইড্রেশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে OH সাইড গ্রুপের সঙ্গে বলা হয় এস্টার লিংকেজ (ester linkage)। ফ্যাটি অ্যাসিড চেইন-এ কোনো ডাবল বন্ড না থাকলে তাকে স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, যেমন- স্টিয়ারিক অ্যাসিড। ফ্যাটি অ্যাসিডের হাইড্রোকার্বন চেইন-এ এক বা একাধিক বন্ড থাকলে তাকে বলা হয় আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, যেমন- লিনোলিক (linoleic) অ্যাসিড, লিনোলেনিক (linolenic) অ্যাসিড। স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড (যা প্রাণী চর্বিতে থাকে) আর্টারিগাত্রে জমা হয়ে রক্ত চলাচলের ক্ষতি করে দেয়, তাই হৃদরোগ হয়। আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডে তা হয় না।

মানুষ (এবং অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণী) ফ্যাটি অ্যাসিডের নবম কার্বনের পর কোনো ডাবল বন্ড তৈরি করতে পারে না, তাই আমাদের খাদ্যে সামান্য আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড যোগ করতে হয়। এ জন্যই linoleic এবং linolenic অ্যাসিডদ্বয়কে আবশ্যকীয় (essential) ফ্যাটি অ্যাসিড বলা হয়। আমাদের খাদ্যে সাধারণত যথেষ্ট আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে, তাই পুষ্টিজনিত অসুবিধা দেখা দেয় না।

(ii) মোম (Wax) : ফ্যাটি অ্যাসিড, ট্রাইহাইড্রিক অ্যালকোহলের পরিবর্তে মনোহাইড্রিক অ্যালকোহলের উপাদানের সাথে এস্টারীভূত হলে তাকে মোম বলে। কোনো কোনো উদ্ভিদে প্রাপ্ত মোম ২৪ থেকে ৩৬টি পরমাণুবিশিষ্ট। মৌচাক থেকেও প্রাকৃতিক মোম পাওয়া যায়। সাধারণ তাপমাত্রায় মোম কঠিন থাকে। মোম পানিতে অদ্রবণীয় এবং রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয়, কারণ এদের হাইড্রোকার্বন চেইন-এ কোনো ডবল বন্ড থাকে না। এদের চেইন অত্যন্ত দীর্ঘকায়। ফ্যাটি অ্যাসিডের পরিসর C_{14} থেকে C_{36}। আর অ্যালকোহলের পরিসর C_{16} থেকে C_{36}।

মোম-এর কাজ : ১। উদ্ভিদ অঙ্গের উপরিতলে প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে। ২। মোম সাধারণত কাণ্ড, পাতা ও ফলের ওপর প্রতিরোধক স্তর হিসেবে অবস্থান করে। ৩। মোম থেকে মোমবাতি তৈরি হয়। ৪। বিভিন্ন শিল্পেও মোম ব্যবহৃত হয়।

২। যৌগিক লিপিড (Compound lipids) : যে লিপিড সরল লিপিডের সাথে কিছু জৈব ও অজৈব পদার্থ সংমিশ্রণে তৈরি হয় তাকে যৌগিক লিপিড বলে। এটি স্নেহ ও অস্নেহ জাতীয় পদার্থের যৌগ। তিন রকম যৌগিক লিপিড নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

(i) ফসফোলিপিড (Phospholipids) : গ্লিসারোল, ফ্যাটি অ্যাসিড ও ফসফেটের সমন্বয়ে গঠিত লিপিডকে বলা হয় ফসফোলিপিড। লেসিথিন (lecithin), সেফালিন (cephaline), প্লাজমালোজেন (plasmalogen) ইত্যাদি কয়েকটি ফসফোলিপিডের নাম। ফসফোলিপিড-এর বিশেষ উপাদান হলো ফসফাটাইডিক অ্যাসিড। সেল মেমব্রেন, মাইটোকন্ড্রিয়া, টনোপ্লাস্ট, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, নিউক্লিয়ার এনভেলপ ইত্যাদি ফসফোলিপিড সম্বলিত।

কাজ : ১। কোষ ঝিল্লি, বিভিন্ন কোষ অঙ্গাণুর ঝিল্লির গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে। ২। আয়ন বাহক হিসেবে কাজ করে। ৩। কতিপয় এনজাইমের প্রোসথেটিক গ্রুপ হিসেবে কাজ করে। ৪। ফসফোলিপিড রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। ৫। কোষের ভেদ্যতা ও পরিবহন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

(ii) গ্লাইকোলিপিড (Glycolipids) : সরল লিপিডের সাথে যখন কার্বোহাইড্রেট যুক্ত থাকে তখন তাকে গ্লাইকোলিপিড বলে। এতে ফসফেটের পরিবর্তে গ্যালাকটোজ বা গ্লুকোজ থাকে। উদ্ভিদের ফটোসিনথেটিক অঙ্গে ফসফোলিপিড অপেক্ষা গ্লাইকোলিপিড বেশি থাকে। ক্লোরোপ্লাস্টের মেমব্রেনে গ্লাইকোলিপিড অধিক থাকে। এতে গ্যালাকটোজ থাকলে তাকে গ্যালাকটোলিপিড বলে। সূর্যমুখী ও তুলার বীজ থেকে গ্লাইকোলিপিড শনাক্ত করা হয়েছে। গ্লাইকোপ্রোটিন ও গ্লাইকোলিপিডকে মিলিতভাবে গ্লাইকোক্যালিক্স বলা হয়।

কাজ : ১। ফটোসিনথেটিক অঙ্গাণু গঠনে ভূমিকা রাখা। ২। ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়ায় সাহায্য করা।

(iii) সালফোলিপিড (Sulpholipids) : যে গ্লাইকোলিপিডে সালফার থাকে তাকে সালফোলিপিড বলে। উদ্ভিদে প্রচুর পরিমাণে এই জৈব যৌগটি পাওয়া যায় ক্লোরোপ্লাস্টে এর উপস্থিতি সীমাবদ্ধ থাকে।

৩। উদ্ভূত বা উৎপাদিত লিপিড (Derived lipids) : যৌগিক লিপিডের আর্দ্র বিশ্লেষণের ফলে যে লিপিড উদ্ভূত হয় তাকে উদ্ভূত লিপিড বলে। আবার যেসব যৌগ আইসোপ্রিন এককের (C_5H_8) পলিমার দিয়ে গঠিত তাকে টারপিনয়েড লিপিড বলে। আইসোপ্রিন হলো ৫ কার্বনবিশিষ্ট যৌগ। স্টেরয়েড, টারপিনস, রাবার ইত্যাদি টারপিনয়েড লিপিডের উদাহরণ। নিম্নে এদের বর্ণনা করা হলো-

(i) স্টেরয়েড (Steroids) : চারটি ভিন্নতর কার্বন রিং-এর শিরদাঁড়া (backbone) এবং তাতে কার্বনের পার্শ্বশিকল নিয়ে গঠিত লিপিড হলো স্টেরয়েড। যে সব স্টেরয়েড-এ হাইড্রক্সিল (–OH) গ্রুপ থাকে, তাদেরকে বলা হয় স্টেরল (sterol)। ব্যাকটেরিয়া ও সায়ানোব্যাকটেরিয়া ছাড়া অন্যান্য উদ্ভিদে স্টেরল বিদ্যমান। এরা উদ্ভিদে মুক্ত অবস্থায় অথবা গ্লুকোসাইড হিসেবে বিরাজমান থাকে। কোলেস্টেরল (cholesterol), স্টিগমাস্টেরল (stigmasterol), আর্গস্টেরল (ergosterol), β-সিটোস্টেরল (β-sitosterol), ডিজিট্যালিন প্রভৃতি স্টেরয়েডস্ এর উদাহরণ। হৃদপিণ্ডের চিকিৎসায় ডিজিটালিন ব্যবহৃত হয়। নিউরোস্পোরা ও ঈস্ট এ আর্গস্টেরল পাওয়া যায়। আলু, চুপরিআলুতে কোলেস্টেরল পাওয়া যায়। অধিক পরিমাণ কোলেস্টেরল প্রাণিদেহে পাওয়া যায়।

কোলেস্টেরল : কোলেস্টেরল হলো সকল প্রাণীর চর্বিতে বিদ্যমান একটি সাধারণ স্টেরল যা প্লাজমামেমব্রেনের প্রতিপ্রয়োজনীয় উপাদান, পিত্তের প্রধান উপাদান এবং ভিটামিন-ডি এর পূর্বসূচক।

কোলেস্টেরল দুই প্রকার; যথা- (i) লো-ডেনসিটি লিপোপ্রোটিন বা LDL এবং (ii) হাই-ডেনসিটি লিপোপ্রোটিন বা HDL। মানুষের রক্তে কোলেস্টেরল বেশি থাকা ক্ষতিকর (স্বাভাবিক মাত্রা ০.১৫-১.২০%)। রক্তে HDL বেশি থাকা মন্দ নয় তবে LDL বেশি থাকা খুবই ক্ষতিকর। পুরুষের রক্তে HDL বেশি থাকে এবং LDL কম থাকে। এজন্য পুরুষ লোক অপেক্ষা স্ত্রীলোকের হৃদরোগ কম হয়। কোলেস্টেরল বেশি থাকলে রক্তনালি সরু হয়ে হৃদযন্ত্রে রক্ত চলাচল কমে যায় ফলে করোনারি থ্রম্বোসিস নামক হৃদরোগ হয়। মানুষের রক্তে HDL এর মাত্রা বেশি (40 <mg/dl) থাকা ভালো। তবে LDL এর মাত্রা কম (<100 mg/dl) থাকা ভালো।

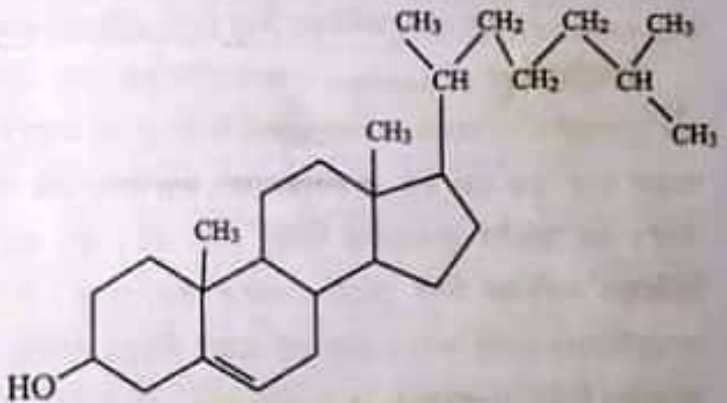

চিত্র : কোলেস্টেরল এর গঠন।

কাজ : বিভিন্ন প্রকার চিকিৎসায় স্টেরয়েড ব্যবহৃত হয়। কিছু স্টেরয়েড হরমোন প্রাণীর যৌন বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করে। প্রোটিন হজম, চর্বি হজম, পানির ভারসাম্য রক্ষা, কোষ পর্দা গঠন প্রভৃতি কাজ বিভিন্ন প্রকার স্টেরয়েড করে থাকে।

(ii) টারপিনস (Terpenes) : ১০ থেকে ৪০টি কার্বন পরমাণুবিশিষ্ট আইসোপ্রিনয়েড যৌগকে টারপিনস বলে। এর সাধারণ সংকেত হলো $(C_5H_8)n$। পুদিনা, তুলসী ইত্যাদিতে উদ্বায়ী তেল হিসেবে টারপিনস পাওয়া যায়।

কাজ : সুগন্ধী প্রসাধনী সামগ্রী তৈরিতে ও বার্নিশের কাজে ব্যবহৃত হয়।

(iii) রাবার (Rubber) : প্রায় ৩০০০-৬০০০ হাজার আইসোপ্রেন একক যুক্ত হয়ে রাবার তৈরি হয়। *Hevea brasiliensis* (Euphorbiaceae) থেকে প্রাকৃতিক রাবার (প্যারা রাবার) পাওয়া যায়। এছাড়া *Ficus elastica*, *Palaquium gutta*, *Castilla elastica* ইত্যাদি বৃক্ষের কষ থেকেও সামান্য পরিমাণ রাবার সংগ্রহ করা যায়। প্রাকৃতিক রাবার ছাড়াও কৃত্রিম উপায়ে রাবার উৎপাদন করা হয়। এদেরকে গাম রাবার বলে।

কাজ : ট্রাক, বাস, মোটরগাড়ি, রিক্সা, সাইকেল ইত্যাদির টায়ার তৈরি করার জন্য রাবার ব্যবহৃত হয়।

লিপিড-এর রাসায়নিক উপাদান

লিপিড সাধারণত কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নিয়ে গঠিত। এতে ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারোল ছাড়া ফসফরাস, নাইট্রোজেন ক্ষারকও থাকতে পারে। মোমে গ্লিসারোল থাকেনা - এর পরিবর্তে অ্যালকোহল বা কোলেস্টেরল থাকে। গ্লাইকোলিপিডে ফ্যাটি অ্যাসিড, হেক্সোজ শুগার ও নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থ থাকে।

ভিন্নধর্মী লিপিড

কিছু লিপিডের রাসায়নিক গঠন ট্রাইগ্লিসারাইড্স ও ফসফোলিপিড থেকে আলাদা। নিচে কয়েকটি নিয়ে আলোচনা করা হলো।

• **ক্যারোটিনয়েড্স (Carotenoids) :** এরা আলোক শোষণকারী পিগমেন্ট। বিটা-ক্যারোটিন পাতায় আলোকশক্তি শোষণ করে সালোকসংশ্লেষণে সহায়তা করে। এছাড়া বিটা-ক্যারোটিন আলোক অনুধাবন করে ফটোট্রপিজম ঘটায়। মানবদেহে বিটা-ক্যারোটিন ভেঙে দুই অণু ভিটামিন-এ তৈরি করে যা থেকে পরে রডোপসিন (rhodopsin) তৈরি হয়। রডোপসিন দৃষ্টিশক্তি (vision) দান করে। ভিমের কুসুম, গাজর, টমেটো ইত্যাদি থেকে বিটা ক্যারোটিন পাওয়া যায়।

• **স্টেরয়েড্স (Steroids) :** Testosterone এবং estrogens হলো স্টেরয়েড হরমোন যা মেরুদন্ডী প্রাণীতে যৌন বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করে। Cortisol কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন হজম, লবণ ভারসাম্য, পানি ভারসাম্য এবং যৌন বিকাশে অবদান রাখে। Cholesterol লিভারে তৈরি হয় এবং কোষীয় ঝিল্লির গঠনে সাহায্য করে, testosterone এবং অন্যান্য স্টেরয়েড হরমোন সৃষ্টির সূচনা দ্রব্য হিসেবে কাজ করে। বাইল (bile) সল্ট তৈরিতেও সাহায্য করে যা খাদ্যের চর্বি হজমে অবদান রাখে। রক্তে অতিমাত্রায় কোলেস্টেরল ধমনীর লুমেন বন্ধ করে দিতে পারে। রক্তে LDL (Low Density Lipoprotein) বেশি থাকা ক্ষতিকর কিন্তু HDL (High Density Lipoprotein) বেশি থাকা মঙ্গলজনক।

ভিটামিনসমূহ (Vitamins) : ক্যারোটিনয়েড এবং স্টেরয়েড-এর মতো কতক ভিটামিনও আইসোপ্রেন (isoprene)-এর রাসায়নিক পরিবর্তন ও কোভেলেন্ট লিংকিং-এর মাধ্যমে তৈরি হয়। ক্যারোটিনয়েড থেকে ভিটামিন-A তৈরি হয়। এর অভাব হলে ত্বক শুষ্ক হয়, রাতকানা রোগ হয় এবং বৃদ্ধি রহিত হয়। ভিটামিন-D অন্ত্রকর্তৃক ক্যালসিয়াম শোষণ নিয়ন্ত্রণ করে। এর অভাবে হাড়জনিত বিভিন্ন রোগ হয়। এক দল লিপিড ভিটামিন-E হিসেবে পরিচিত। এরা জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ার ক্ষতিকর দিক থেকে কোষকে রক্ষা করে। ভিটামিন-K সবুজ শাকসবজিতে পাওয়া যায়। আবার অন্ত্রে ব্যাকটেরিয়াও তৈরি করে। এরা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন হলো B ও C এবং পানিতে অদ্রবণীয় ভিটামিন হলো A, D, E এবং K।

জীবদেহে লিপিডের ভূমিকা (Role of Lipids)

জীবদেহে লিপিডের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। সেলমেমব্রেন থেকে শুরু করে অধিকাংশ অঙ্গাণুর জমাট ফসফোলিপিড দিয়ে গঠিত। ফসফোলিপিড কেবল এদের গঠন উপাদান হিসেবেই কাজ করে না, দ্রব্যের আদান-প্রদানেও বিশেষ ভূমিকা রাখে। লিপিডের অভাবে যদি মাইটোকন্ড্রিয়া নামক অঙ্গাণুটি অকার্যকর হয়ে যায় তবে বায়বীয় জীব বেঁচে থাকার শক্তি যোগাবে কে? লিপিডঘটিত ক্যারোটিনয়েডস্, স্টেরয়েড হরমোন বা ভিটামিন A, D, E, K প্রভৃতি জীবদেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আমাদের খাদ্য তালিকায় লিপিডের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এ থেকে অধিক শক্তি পাওয়া যায়। লিপিড ত্বকের শুষ্কতা দূর করে এবং ত্বক মসৃণ রাখে। গ্লাইকোলিপিড সালোকসংশ্লেষণে ভূমিকা রাখে। ফসফোলিপিড কোষের আয়নের বাহক হিসেবেও কাজ করে। টারপিনস জাতীয় লিপিড উদ্ভিদে সুগন্ধি সৃষ্টি করে।

এনজাইম (Enzyme) বা উৎসেচক

এনজাইম হলো প্রোটিন জাতীয় পদার্থ। জীবকোষে এনজাইম অতি অল্পমাত্রায় বিদ্যমান থাকে। এনজাইম বিভিন্ন বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে বিক্রিয়ার হারকে ত্বরান্বিত করে এবং বিক্রিয়া শেষে অপরিবর্তিতভাবে মুক্ত হয়ে যায়। বলা হয় জীবনতন্ত্রের (living system) গতিময় প্রাণরাসায়নিক অবস্থা বহুলাংশে এনজাইম কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। বিজ্ঞানী কুন (E. H.

...১৮৭৮ সালে সর্বপ্রথম এনজাইম শব্দটি ব্যবহার করেন। ঈস্ট কোষে জাইমেজ আবিষ্কৃত হয় ১৮৯৭ সালে। ...James Sumner, 1926) প্রথম ইউরিয়েজ (urease) নামক এনজাইমটি কোষ হতে পৃথক করেন এবং বলেন যে, ...es are proteins"। যে প্রোটিন জীবদেহে অল্পমাত্রায় বিদ্যমান থেকে বিক্রিয়ার হারকে ত্বরান্বিত করে কিন্তু ...শেষে নিজেরা অপরিবর্তিত (শর্ত সাপেক্ষে) থাকে, সে প্রোটিনই এনজাইম। এনজাইমকে জৈব অনুঘটকও ...catalyst) বলা হয়ে থাকে। এনজাইম কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও সালফার মৌলে গঠিত। ...এনজাইমে ফসফরাস, তামা, দস্তা, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি মৌল থাকে বলে জানা গেছে।

...জাইমের ভৌত বৈশিষ্ট্য বা এনজাইমের ধর্ম IUB অনুযায়ী এনজাইম ৬ প্রকার।

- এনজাইম হলো প্রধানত প্রোটিনধর্মী।
- জীবকোষে এনজাইম কলয়েড (colloid) রূপে অবস্থান করে।
- এর কার্যকারিতা pH দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সকল এনজাইমই pH 6-9 এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্রিয়াশীল।
- এরা তাপ প্রবণ (heat sensitive) অর্থাৎ সাধারণত 35°C – 40°C তাপমাত্রায় অধিক ক্রিয়াশীল। অধিক তাপে এনজাইম নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু কম তাপে নষ্ট হয় না।
- এনজাইম খুব অল্প মাত্রায় বিদ্যমান থেকে বিক্রিয়ার হারকে ত্বরান্বিত করে।
- এনজাইম কেবলমাত্র বিক্রিয়ার হারকে ত্বরান্বিত করে কিন্তু বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থার (state of equilibrium) পরিবর্তন করে না।
- এনজাইমের কার্যকারিতা সুনির্দিষ্ট অর্থাৎ কোনো একটি নির্দিষ্ট এনজাইম শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট বিক্রিয়া বা নির্দিষ্ট বিক্রিয়া গ্রুপকে প্রভাবিত করে, অন্য বিক্রিয়াকে নয়।

...জাইমের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য : সব এনজাইমই প্রোটিন জাতীয়, তাই প্রোটিন গঠনকারী অ্যামিনো অ্যাসিডই ...সমূহের মূল গাঠনিক উপাদান। একটি সুনির্দিষ্ট এনজাইমের অ্যামিনো অ্যাসিড সংখ্যা ও অনুক্রম সুনির্দিষ্ট। ভিন্ন ...এনজাইমের অ্যামিনো অ্যাসিডের সংখ্যা ও অনুক্রম ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এনজাইম অম্লীয় ও ক্ষারীয় উভয় ...মাধ্যমে ক্রিয়াশীল। কো-এনজাইম, কো-ফ্যাক্টর ইত্যাদির উপস্থিতিতে এনজাইমের ক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। এনজাইম ...পানি, গ্লিসারল ও লঘু অ্যালকোহলে দ্রবণীয়। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, সব প্রোটিনই এনজাইম নয়।

...জাইমের নামকরণ : সাধারণত তিনটি পৃথক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে এনজাইমের নামকরণ করা হয়। যথা- ...সাবস্ট্রেট-এর ধরন অনুসারে ২। বিক্রিয়ার ধরন অনুসারে এবং ৩। সাবস্ট্রেট-বিক্রিয়ার মিলিত বৈশিষ্ট্য অনুসারে।

১। সাবস্ট্রেট-এর ধরন অনুসারে : এনজাইম যার ওপর ক্রিয়া করে তাকে বলা হয় সাবস্ট্রেট (substrate)। যে ...টি হলো যে পদার্থের ওপর এনজাইম ক্রিয়া করে তার শেষে- 'এজ' (ase) যোগ করে এনজাইমের নামকরণ করা হয়।

সাবস্ট্রেট		এনজাইম
সুক্রোজ-এর সাথে 'এজ' যোগ করে	=	সুকরেজ
ইউরিয়া-এর সাথে 'এজ' যোগ করে	=	ইউরিয়েজ
আরজিনিন-এর সাথে 'এজ' যোগ করে	=	আরজিনেজ
টাইরোসিন-এর সাথে 'এজ' যোগ করে	=	টাইরোসিনেজ
লিপিড-এর সাথে 'এজ' যোগ করে	=	লাইপেজ
প্রোটিন-এর সাথে 'এজ' যোগ করে	=	প্রোটিয়েজ

২। বিক্রিয়ার ধরন অনুসারে : এনজাইম যে ধরনের বিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত বা প্রভাবিত করে সেই বিক্রিয়ার নামের প্রথমাংশের সাথে 'এজ' যোগ করে এনজাইমের নামকরণ করা হয়। একটি ছকের মাধ্যমে এটি দেখানো হলো।

বিক্রিয়ার নাম	+ এজ	এনজাইমের নাম
হাইড্রোলাইসিস	+ এজ	= হাইড্রোলেজ
অক্সিডেশন	+ এজ	= অক্সিডেজ
রিডাকশন	+ এজ	= রিডাকটেজ

৩। সাবস্ট্রেট-বিক্রিয়ার মিলিত বৈশিষ্ট্য অনুসারে : সাবস্ট্রেটের সাথে এনজাইমের নাম যোগ করে এ জাতীয় নামকরণ করা হয়। সাধারণত বিক্রিয়াকে নির্দিষ্ট করে বোঝাতে এ জাতীয় নামকরণ করা হয়। যেমন সাবস্ট্রেট হেক্সোজ (গ্লুকোজ) এবং এনজাইম কাইনেজ, তাই যুক্ত নাম দেয়া হয়েছে **হেক্সোকাইনেজ**। গ্লুকোজ থেকে গ্লুকোজ-৬-ফসফেট সৃষ্টিকালে এ এনজাইম কার্যকরী হয়। ফসফোইনল পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে পাইরুভিক অ্যাসিড তৈরির বিক্রিয়ার এনজাইমের নাম **পাইরুভিক অ্যাসিড কাইনেজ**। এমনইভাবে ফসফেফ্রুক্টোকাইনেজ, ফসফোগ্লুকো-আইসোমারেজ ইত্যাদি।

প্রোসথেটিক গ্রুপ; কো-ফ্যাক্টর, কো-এনজাইম

- সব এনজাইমই প্রোটিন। যে এনজাইম শুধু প্রোটিন দিয়ে গঠিত তাকে বলা হয় **সরল এনজাইম**।
- কোনো কোনো এনজাইমে প্রোটিন অংশের সাথে একটি অপ্রোটিন অংশ সংযুক্ত থাকে। এ ধরনের এনজাইমকে (তথা প্রোটিনকে) বলা হয় **কনজুগেটেড প্রোটিন** (conjugated proteins).
- কনজুগেটেড প্রোটিন এর প্রোটিন অংশকে **অ্যাপোএনজাইম** (apoenzyme) বলে।
- কনজুগেটেড প্রোটিনের অপ্রোটিন অংশকে **প্রোসথেটিক গ্রুপ** বলে।
- প্রোসথেটিক গ্রুপ কোনো ধাতুর আয়ন মেটাল (metal) হলে তাকে **কো-ফ্যাক্টর** (co-factor) বলা হয়। পূর্বে একে অ্যাক্টিভেটর বলা হতো, যেমন- Fe^{2+}, Mg^{2+}, Zn^{2+}

কো-এনজাইম

এনজাইমের প্রোসথেটিক গ্রুপটি কোনো জৈব রাসায়নিক পদার্থ হলে (organic compound) তাকে **কো-এনজাইম** (co-enzyme) বলা হয়; যেমন- FAD, NAD ইত্যাদি।

এনজাইমেটিক ক্রিয়াকালে কো-এনজাইম সাধারণত সাবস্ট্রেট হতে যে এটম বিয়োজন হয় তার গ্রহীতা (acceptor) হিসেবে বা সাবস্ট্রেট-এর সাথে যে এটম যোগ হয় তার দাতা (donor) হিসেবে কাজ করে। এনজাইম হতে কো-এনজাইম অংশ পৃথক করে নিলে এনজাইমের কার্যক্ষমতা বহুলাংশে হ্রাস পায়। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কো-এনজাইম হলো-

(i) FAD. = Flavin Adenine Dinucleotide
$FADH_2$ = Reduced Flavin Adenine Dinucleotide
(ii) FMN = Flavin Mononucleotide (ভিটামিন B_2-মনোফসফেট)
(iii) NAD = Nicotinamide Adenine Dinucleotide
$NADH + H^+$ = Reduced Nicotinamide Adenine Dinucleotide
(iv) NADP = Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate
$NADPH + H^+$ = Reduced Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate
(v) CoA = Co-enzyme A
(vi) ATP = Adenosine Triphosphate

এনজাইমের কাজের কৌশল (Mechanism of enzyme action) বা ক্রিয়ার প্রকৃতি

কোনো নির্দিষ্ট এনজাইমের এক বা একাধিক সক্রিয় স্থান (active site) থাকে। জার্মান রসায়নবিদ Emil Fischer (১৮৯৪) এনজাইমের অ্যাকটিভ সাইট প্রস্তাব করেন। পলিপেপটাইড চেইনের ফলডিং-এর মাধ্যমে অ্যাকটিভ সাইট সৃষ্টি

...টিভ সাইট ও সাবস্ট্রেটের সম্পর্ক হলো তালা-চাবির মতো সুনির্দিষ্ট। (১) প্রথমে সাবস্ট্রেট অণু এনজাইমের ...স্থান তথা 'অ্যাকটিভ সাইট'-এ সংযুক্ত হয়ে এনজাইম-সাবস্ট্রেট যৌগ সৃষ্টি করে। (২) দ্বিতীয় পর্যায়ে এনজাইম-...ট্রেট যৌগ ভেঙে গিয়ে নতুন পদার্থ সৃষ্টি হয় এবং এনজাইম অপরিবর্তিতভাবে পৃথক হয়ে যায়।

এনজাইম + সাবস্ট্রেট (A এবং B) ⟶ এনজাইম-সাবস্ট্রেট যৌগ ⟶ এনজাইম + প্রোডাক্ট (C এবং D)
সুক্রেজ + সুক্রোজ ⟶ সুক্রেজ – সুক্রোজ যৌগ ⟶ সুক্রেজ + গ্লুকোজ (C) + ফ্রুক্টোজ (D)

কোনো কোনো ক্ষেত্রে এনজাইমের অ্যাকটিভ সাইট-এ সাবস্ট্রেট সঠিকভাবে 'fit' হয় না। এসব ক্ষেত্রে সাবস্ট্রেট ...টিভ সাইট-এ সংযুক্ত হলে পুরো এনজাইমের আকার পরিবর্তন হয়ে যায় এবং এনজাইম সাবস্ট্রেটকে সঠিকভাবে ...টিভ সাইট-এ 'fit' করে নেয়। একে বলা হয় **'induced fit'**। এ কারণে তালা-চাবি মতবাদ পরিত্যাজ্য বলে মনে ...য়।

কিছু কিছু পদার্থ এনজাইমের কাজে বাধাদান করে বা বিঘ্ন ঘটায়। এদেরকে ইনহিবিটর বলে। ইনহিবিটর (inhibitor) ...জাইমের অ্যাকটিভ সাইট-এ আগেই সংযুক্ত হয়ে যায়, ফলে সাবস্ট্রেট ঐ অ্যাকটিভ সাইট-এ আর যুক্ত হতে পারে না। ...এনজাইম কাজ করতে পারে না। আবার কতক ইনহিবিটর (বাধাদানকারী) অ্যাকটিভ সাইট ছাড়া অন্য কোনো স্থানে ...যুক্ত হয়ে এনজাইমের অ্যাকটিভ সাইট নষ্ট করে ফেলে, কাজেই সাবস্ট্রেট সেখানে যুক্ত হতে পারে না। কিছু কিছু

এনজাইমের কাজের কৌশল।

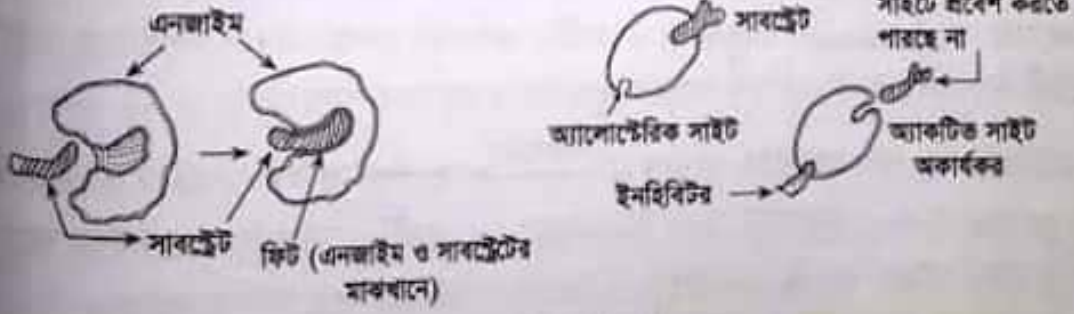

effector

...জাইম আছে যাদের একাধিক সাবইউনিট থাকে। এদের আকৃতি ও কাজ সহজেই পরিবর্তনশীল হতে পারে। এ ধরনের ...ইমকে বলা হয় **Allosteric enzymes**। অ্যালোস্টেরিক এনজাইমের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে effector নামক ...অণু। ইফেক্টর, এনজাইমের অ্যাকটিভ সাইট ছাড়া অ্যালোস্টেরিক সাইট-এ সংযুক্ত হয়ে অ্যাক্টিভেটর হিসেবে অথবা ...হিবিটর হিসেবে কাজ করে।

...কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পন্ন করতে কিছুটা অতিরিক্ত শক্তির দরকার হয়। এই অতিরিক্ত শক্তিকে কার্যকরী ...। এনজাইম-সাবস্ট্রেট এর কার্যকরী শক্তি কম। তাই কম কার্যকরী শক্তিসম্পন্ন সাবস্ট্রেট অণু এনজাইমের সাথে ... এনজাইম-সাবস্ট্রেট যৌগ সৃষ্টি করে, ফলে বিক্রিয়ার হার বেড়ে যায়।

...: শিক্ষার্থীগণ এনজাইমের কাজের কৌশল বিষয়টি বোর্ডে উপস্থাপন করবে এবং ব্যাখ্যা করবে।

এনজাইমের শ্রেণিবিন্যাস : গঠন প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে এনজাইমসমূহকে শ্রেণিবিন্যস্ত করা যায়। অন্য ধরনের বিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে তার ওপর ভিত্তি করেও এনজাইমসমূহকে শ্রেণিবিন্যস্ত করা যায়।

(ক) গঠন বৈশিষ্ট্যভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস : গঠন বৈশিষ্ট্যভিত্তিক এনজাইম দু'প্রকার। যথা-

১। সরল এনজাইম (Simple enzyme) : যে এনজাইমের সম্পূর্ণ অংশই শুধু প্রোটিন দিয়ে গঠিত তাকে এনজাইম বলে। যেমন-সুকরেজ, অক্সিডেজ।

২। যৌগিক বা সংযুক্ত এনজাইম (Complex বা conjugated enzyme) : যে এনজাইমের প্রোটিন অংশের একটি অপ্রোটিন অংশে যুক্ত থাকে তাকে যৌগিক এনজাইম বা কনজুগেটেড এনজাইম বলা হয়। যেমন-FAD, NAD

(খ) কী ধরনের বিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে তার ওপর ভিত্তি করে এনজাইমসমূহকে নিম্নলিখিত প্রকারে শ্রেণি করা হয়।

১। অক্সিডোরিডাকটেজ (Oxido-reductase) এনজাইম : এ জাতীয় এনজাইম কোনো পদার্থের সাথে হাইড্রো অক্সিজেন কিংবা ইলেকট্রন সংযুক্ত করে অথবা কোনো পদার্থ থেকে এগুলো বিযুক্ত করে। অক্সিজেন সংযো হাইড্রোজেন বিয়োজন বা ইলেকট্রন অপসারণকে বলা হয় **অক্সিডেশন** (oxidation) বা **জারণ**। আবার **হাইড্রোজেন** সং বা অক্সিজেন বিয়োজন বা ইলেকট্রন যোগ হলো **রিডাকশন** (reduction) বা **বিজারণ**। বাংলায় এদেরকে জা (oxidation) **বিজারণ** (reduction) এনজাইম বলা হয়। যেমন- সাইটোক্রোম অক্সিডেজ, ফসফোগ্লিসারাল্ডিহাইড ডিহাইড্রোজিনেজ।

ফসফোগ্লিসার‍্যাল্ডিহাইড ডিহাইড্রোজিনেজ
৩-ফসফোগ্লিসার‍্যাল্ডিহাইড + ফসফেট ⇌ ১, ৩-বিসফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড
NAD → NADH + H^+

এখানে NAD **বিজারিত** হয়ে (হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে) NADH + H^+ তে পরিণত হয়েছে এবং ৩-ফসফোগ্লিসার‍্যাল্ডি হাইড্রোজেন হারিয়ে **জারিত** (oxidized) হয়েছে।

২। ট্রান্সফারেজ (Transferase) এনজাইম : এ জাতীয় এনজাইম কোনো একটি পদার্থ হতে একটি **গ্রুপকে** (যেম NH_2) অপসারিত করে অন্য একটি পদার্থের সাথে সংযুক্ত করতে সহায়তা করে।

গ্লুটামিক অ্যাসিড + অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড —ট্রান্সফারেজ→ α- কিটোগ্লুটামিক অ্যাসিড + অ্যাসপারটিক অ্যাসি

এক্ষেত্রে গ্লুটামিক অ্যাসিড হতে NH_2 গ্রুপ অপসারিত হয়ে অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিডের সাথে যুক্ত হয়ে তা অ্যাসপারটিক অ্যাসিডে পরিণত করেছে এবং নিজে α- কিটোগ্লুটামিক অ্যাসিডে পরিণত হয়েছে।

৩। হাইড্রোলাইটিক এনজাইম বা হাইড্রোলেজ (Hydrolase) এনজাইম : এ জাতীয় এনজাইম কোনো পদা বিশেষ বন্ডের সাথে পানির অণু সংযুক্ত করে তাকে হাইড্রোলাইসিস করতে সহায়তা করে। সুকরেজ, প্রোটি ফসফেটেজ, এস্টারেজ ইত্যাদি এ জাতীয় এনজাইম।

সুক্রোজ + পানি —সুকরেজ→ গ্লুকোজ + ফ্রুক্টোজ

৪। লাইয়েজ (Lyase) এনজাইম : এ শ্রেণির এনজাইম হাইড্রোলাইসিস ও জারণ-বিজারণ ছাড়াই অন্য কার্য সাবস্ট্রেটের মূলককে ট্রান্সফার করে থাকে। এরা কার্বন-কার্বন, কার্বন-অক্সিজেন, কার্বন-নাইট্রোজেন প্রভৃতি যোজ ওপর কাজ করে। উদাহরণ- অ্যালডোলেজ, আইসোসাইট্রেট লাইয়েজ।

L-ম্যালেট —L- ম্যালেট হাইড্রোলাইয়েজ→ ফিউমারেট + পানি

আইসোমারেজ (Isomerase) এনজাইম : এ জাতীয় এনজাইম অ্যালডোজ (aldose) এবং কিটোজ (ketose) এর আইসোমেরিক পরিবর্তন সাধন করে।

গ্লুকোজ-৬-ফসফেট ⇌ (ফসফোগ্লুকো-আইসোমারেজ) ফ্রুক্টোজ-৬-ফসফেট

লাইগেজ (Lygase) এনজাইম : এ জাতীয় এনজাইম ATP-এর সহায়তায় দুই বা ততোধিক সাবস্ট্রেটকে সংযুক্ত করে যৌগ সৃষ্টি করে। যেমন-

গ্লুটামিক অ্যাসিড + NH_3 + ATP ⇌ (গ্লুটামিক সিনথেটেজ) গ্লুটামিন + ADP + Pi

কার্বক্সিলেজ (Carboxylase) এনজাইম : এ জাতীয় এনজাইম কোনো পদার্থের সাথে CO_2 অণু যুক্ত করতে বা কোনো পদার্থ হতে CO_2 বিযুক্ত করতে সহায়তা করে।

অক্সালো সাকসিনিক অ্যাসিড ⇌ (কার্বোক্সিলেজ) α- কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড + CO_2

এপিমারেজ (Apimerase) এনজাইম : এ জাতীয় এনজাইমসমূহ কোনো পদার্থকে এর এপিমারে পরিণত করতে পারে। এপিমার অণুগুলো কেবলমাত্র একটি কার্বন এটমের কনফিগারেশন দিয়ে পার্থক্যমণ্ডিত।

ফসফোরাইলেজ (Phosphorylase) এনজাইম : এ জাতীয় এনজাইম কোনো পদার্থের সাথে ফসফেট গ্রুপ যুক্ত বা কোনো পদার্থ হতে ফসফেট গ্রুপ বিচ্ছিন্ন করতে সহায়তা করে।

গ্লুকোজ + ATP → (ফসফোরাইলেজ (হেক্সোকাইনেজ)) গ্লুকোজ-৬-ফসফেট + ADP

(IUB অনুসারে এনজাইম প্রধান ৬ প্রকার।)

এনজাইমের কার্যকারিতার প্রভাবকসমূহ

১। তাপমাত্রা : 40° সে. এর উপরে এবং 0° সে. বা তার নিচের তাপমাত্রায় এনজাইমের কার্যকারিতা দারুণভাবে কমে। ...° C – 40° C তাপমাত্রায় এনজাইমের বিক্রিয়ার হার সবচেয়ে বেশি। তাই এই তাপমাত্রাকে পরম তাপমাত্রা (optimum temperature) বলা হয়।

২। pH : অতিরিক্ত অম্ল বা অতিরিক্ত ক্ষার-এ এনজাইমের কার্যকারিতা নষ্ট হয়। এক একটি এনজাইমের এক একটি অপটিমাম pH থাকে।

এনজাইম	অপটিমাম pH
পেপসিন	২.০
ইনভারটেজ	৪.৫
সেলুবায়েজ	৫.০
ইউরিয়েজ	৭.০
ট্রিপসিন	৮.০

৩। পানি : কোষে পরিমিত পানির উপস্থিতিতে এনজাইমের কার্যকারিতা স্বাভাবিক থাকে। শুকনো বীজে পানি না থাকায় এনজাইম নিষ্ক্রিয় থাকে।

৪। ধাতু : কোনো কোনো ধাতুর (যেমন- Mg^{++}, Mn^{++}) উপস্থিতি এনজাইমের কার্যক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। আবার কোনো ধাতুর (যেমন- Ag, Zn, Cu) উপস্থিতি এনজাইমের কর্মক্ষমতা কমিয়ে দিতে পারে।

৫। সাবস্ট্রেট-এর ঘনত্ব : সাবস্ট্রেট-এর ঘনত্বের ওপরও এনজাইমের কর্মক্ষমতা নির্ভরশীল। সাবস্ট্রেটের ঘনত্ব বাড়লে এনজাইমের কর্মক্ষমতা বাড়ে এবং ঘনত্ব কমলে কর্মক্ষমতা কমে।

৬। এনজাইমের ঘনত্ব : এনজাইমের ঘনত্বের ওপরও এদের কর্মক্ষমতা নির্ভরশীল।

৭। **সাবস্ট্রেট-এর ঘনত্ব :** সাবস্ট্রেট-এর পরিমাণ বেড়ে গেলে বিক্রিয়ার হার কমে যেতে পারে।

৮। **অ্যাকটিভেটর :** অ্যাকটিভেটরের উপস্থিতিতে এনজাইমের বিক্রিয়ার হার বাড়ে।

৯। **প্রতিরোধক (ইনহিবিটর) :** এর দ্বারা এনজাইমের কার্যকারিতা বাধাগ্রস্ত হয়।

এনজাইমের কাজ : এনজাইমের প্রধান কাজ হলো জীবদেহের শারীরবৃত্তীয় বিক্রিয়াগুলো পরিচালনা করে জীবদেহকে কর্মক্ষম রাখা। জীবদেহের গঠন ও বৃদ্ধি সবই নিয়ন্ত্রিত হয় এনজাইমের কার্যক্রম দিয়ে। জীবদেহে শক্তি সঞ্চয়ের পেছনে এনজাইম ক্রিয়াশীল, আবার শক্তি নির্গমনের পেছনেও এনজাইম ক্রিয়াশীল। এটি বিক্রিয়ার গতিকে বাড়ায় অথচ বিক্রিয়ার পরে অপরিবর্তিত থাকে। স্বল্প পরিমাণ এনজাইম প্রচুর পরিমাণ সাবস্ট্রেটকে প্রোডাক্টে পরিণত করে। বিভিন্ন জটিল যৌগকে সরল যৌগে পরিণত করে। দেহের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য সংশ্লেষ করে।

জৈবিক কার্যক্রমে এনজাইমের ব্যবহার

১। **সেলুলেজ (Cellulase) :** যে এনজাইম সেলুলোজকে হাইড্রোলাইসিস করে সেলুবায়োজ-উৎপন্ন করে তাকে সেলুলেজ বলে। উদ্ভিদদেহের প্রধান গাঠনিক পদার্থ হলো সেলুলোজ। মৃত উদ্ভিদদেহ পচে না গেলে সমস্ত পৃথিবী আজ মৃত উদ্ভিদ দিয়ে ভরা থাকত। সেলুলেজ এনজাইমের কার্যকারিতায় এরা ক্রমান্বয়ে পচে মাটির সাথে মিশে যায়। তৃণভোজী প্রাণীদের পৌষ্টিক তন্ত্র থেকে সেলুলেজ এনজাইম ক্ষরণ হয় বলে তারা কাঁচা উদ্ভিদ পরিপাক করতে পারে। মানুষের পৌষ্টিকতন্ত্র থেকে সেলুলেজ এনজাইম ক্ষরণ হয় না।

$$\text{সেলুলোজ} \xrightarrow{\text{সেলুলেজ}} \text{সেলুবায়োজ} \xrightarrow{\text{সেলুবায়েজ}} \text{গ্লুকোজ}$$

২। **প্রোটিয়েজ (Protease) :** যে এনজাইম প্রোটিনকে ভেঙে অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত করে তাকে প্রোটিয়েজ বলে। বীজের সঞ্চিত প্রোটিন অঙ্কুরোদগমের সময় প্রোটিয়েজ এনজাইমের কার্যকারিতায় ভেঙে যায় এবং তা দ্রুত জ্রূণে স্থানান্তরিত হয়ে প্রয়োজনানুযায়ী নতুন প্রোটিন তৈরি করে। আমরা যে প্রোটিন জাতীয় খাবার খাই তাও প্রোটিয়েজ এনজাইমের কার্যকারিতায় হজম হয়; ফলে আমাদের দেহ গঠিত হয়। প্রোটিয়েজভুক্ত এনজাইমগুলো হচ্ছে- পেপসিন, ট্রিপসিন ও প্যাপেইন।

৩। **অ্যামাইলেজ (Amylase) :** স্টার্চ-এর প্রধান উপাদান হলো অ্যামাইলোজ। কোনো কোনো স্টার্চ-এর সবটুকুই অ্যামাইলোজ দিয়ে তৈরি। গ্লুকোজ একক সোজা চেইন-এর পলিমার সৃষ্টি করে স্টার্চ গঠন করে। যে এনজাইম অ্যামাইলোজের ওপর কার্যকর ভূমিকা পালন করে তাকে অ্যামাইলেজ বলে। অ্যামাইলেজ দু'ধরনের : যথা- আলফা অ্যামাইলেজ ও বিটা অ্যামাইলেজ। α-অ্যামাইলেজ সাবস্ট্রেটকে ভেঙে প্রথমে ডেক্সট্রিনে পরিণত করে। β-অ্যামাইলেজ পরে ডেক্সট্রিনকে ভেঙে মল্টোজে পরিণত করে।

৪। **ক্যাটালেজ (Catalase) :** প্রায় প্রতিটি জীবকোষেই ক্যাটালেজ এনজাইম পাওয়া যায়। এরা হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড (H_2O_2) কে ভেঙে পানি (H_2O) এবং অক্সিজেন (O_2) উৎপন্ন করে। এক অণু ক্যাটালেজ এনজাইম এক সময়ে লক্ষ লক্ষ H_2O_2 অণুকে বিজারিত করে পানি ও অক্সিজেন-এ রূপান্তরিত করতে পারে।

$$2H_2O_2 \xrightarrow{\text{ক্যাটালেজ}} 2H_2O + O_2$$

৫। **জাইমেজ (Zymase) :** কতক ছত্রাক, বিশেষ করে ঈস্ট (yeast) জাতীয় ছত্রাক কোষে জাইমেজ এনজাইম বিদ্যমান। জাইমেজ এনজাইম একটু জটিল প্রকৃতির। ঈস্ট জাতীয় ছত্রাকে বিদ্যমান যে এনজাইম শর্করাকে কার্মেন্টেশন প্রক্রিয়ায় ইথাইল অ্যালকোহল ও CO_2-এ পরিণত করে তাকে জাইমেজ বলে। অ্যালকোহল উৎপাদন ও বেকারি শিল্পে জাইমেজ এনজাইম ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

$$\underset{\text{গ্লুকোজ}}{C_6H_{12}O_6} \xrightarrow{\text{জাইমেজ}} \underset{\text{ইথাইল অ্যালকোহল}}{2C_2H_5-OH} + 2CO_2$$

বাস্তবিক জীবনে এনজাইমের প্রয়োগ : আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এনজাইমের ব্যবহার বহুবিধ। নিম্নে এনজাইমের কয়েকটি ব্যবহার উল্লেখ করা হলো।

১। **ফলের রস তৈরি (Preparing fruit juice) :** আম, কমলালেবু, আপেল, আঙ্গুর প্রভৃতি ফলের রস তৈরিতে এনজাইম ব্যবহার করা হয়। এসব ফলের রস তৈরিকালে পেকটিন নামক এনজাইম ব্যবহার করলে রসের ঘোলাটে অবস্থা দূর হয় এবং রস পরিষ্কার ও স্বাদযুক্ত হয়।

২। **পনির তৈরি (Making cheese) :** পনির তৈরিতে এনজাইম রেনিন ব্যবহৃত হয়। রেনিন দুধের ননীকে জমাট বাঁধতে সহায়তা করে এবং পরে ননী থেকে পনির তৈরি করা হয়।

৩। **কাপড়ে দাগ মোচন (Destaining of fabrics) :** কাপড়ের দাগ উঠাতে আজকাল এনজাইম ব্যবহার করা হয়। এতে দাগ একেবারে উঠে যায় কিন্তু কাপড়ের কোনো ক্ষতি হয় না।

৪। **চামড়া লোমমুক্তকরণ (Dehairing of hide) :** ট্যানারিতে লেদার তৈরি করার সময় কাঁচা চামড়া থেকে লোম দূর করতে এনজাইম ব্যবহার করা হয়।

৫। **ক্ষত নিরাময় (Wound healing) :** চামড়ায় সৃষ্ট পোড়া ক্ষত নিরাময়ে এক ধরনের এনজাইম ব্যবহার করা হয়।

৬। **হজম সংশোধন (Correcting digestion) :** শরীরে এনজাইমের পরিমাণ কমে গেলে হজমে সমস্যা দেখা যায়। এনজাইমের এই ঘাটতি পূরণ হলে হজমে অনিয়ম দূরীভূত হয়। পেপসিন, অ্যামাইলেজ, পেপ্টেইন ইত্যাদি এনজাইম এক্ষেত্রে সহায়তা করে।

৭। **প্রাণ-রাসায়নিক বিশ্লেষণ (Analyzing biochemicals) :** বর্তমানে ক্লিনিক্যাল বিশ্লেষণে এনজাইম ব্যবহার করা হচ্ছে। ইউরিয়া ও ইউরিক অ্যাসিড শনাক্তকরণে ইউরিয়েজ ও ইউরিকেজ নামক এনজাইম ব্যবহার করা হয়।

৮। **চোখের ছানির অস্ত্রোপচার (Cataract surgery) :** আমেরিকার চক্ষু চিকিৎসক ড. যোসেফ স্পিনা ১৯৮০ সালে এনজাইম ট্রিপসিন প্রয়োগ করে চোখের ছানির অস্ত্রোপচার করেন। ড. যোসেফ স্পিনার অস্ত্রোপচার পদ্ধতিতে সূক্ষ্ম সুঁচ দিয়ে ০.২৫ সেমি প্রশস্ত ছিদ্র করে অন্য একটি সূক্ষ্ম ফাঁপা সুঁচের সাহায্যে অতি সামান্য পরিমাণ ট্রিপসিন চোখের লেন্সে প্রবেশ করেন। ট্রিপসিন চোখের অন্যান্য অংশের কোনো ক্ষতি না করে লেন্সের খোলা অংশ গলিয়ে ফেলে। এরপর এই ছিদ্র টেনে খোলা অংশ বের করে অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করা হয়।

৯। **জমাট রক্ত গলানো (Dissolving blood clod) :** মস্তিষ্ক ও ধমনীর জমাট রক্ত গলাতে ইউরোকাইনেজ নামক এনজাইমের ব্যবহারে জাপানে সফলতা পেয়েছে।

পার্থক্যের বিষয়	এনজাইম	কো-এনজাইম
১। প্রকৃতি	এনজাইম একটি বড় প্রোটিন অণু। অর্থাৎ প্রোটিনধর্মী।	কো-এনজাইম প্রোটিন অণুর একটি অপ্রোটিন অংশ (জৈব রাসায়নিক যৌগ)।
২। আণবিক ওজন	এনজাইমের আণবিক ওজন ১২০০০-১০,০০,০০০০ ডাল্টন।	কো-এনজাইম অংশের আণবিক ওজন অনেক কম (৫০০ ডাল্টন-এর কাছাকাছি)।
৩। কাজ	এনজাইম স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে পারে।	কো-এনজাইম স্বতন্ত্রভাবে অর্থাৎ প্রোটিন অংশ ব্যতীত কাজ করতে পারে না।
৪। তাপের প্রভাব	50°C–60°C তাপমাত্রায় এনজাইমের কার্যকারিতা থাকে না। অর্থাৎ তাপে নষ্ট হয়।	কো-এনজাইমের তাপমাত্রা সহন ক্ষমতা অনেক বেশি। তাই ঐ তাপমাত্রায় কো-এনজাইম অকেজো হয় না।
৫। ডায়ালাইসিস	এটি ডায়ালাইসিস করা যায় না।	এটি ডায়ালাইসিস করা যায়
৬। ভিটামিন	কোন ভিটামিন এনজাইম হিসেবে কাজ করে না।	অনেক ভিটামিন কো-এনজাইম হিসেবে কাজ করে।
৭। উদাহরণ	প্রোটিয়েজ, লাইপেজ ইত্যাদি।	ATP, NAD, FAD ইত্যাদি।

সার-সংক্ষেপ

কার্বোহাইড্রেট : কার্বোহাইড্রেট হলো জীবদেহের উল্লেখযোগ্য জৈব রাসায়নিক পদার্থ। কার্বন-হাইড্রোজেন-অক্সি সহযোগে কার্বোহাইড্রেট গঠিত হয়। কার্বোহাইড্রেটকে বাংলায় শর্করা বলা হয়। জীবদেহে শক্তির প্রধান উৎস কার্বোহাইড্রেট। কার্বোহাইড্রেট মিষ্টি স্বাদবিশিষ্ট, যেমন- গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, সুক্রোজ (চিনি), আবার কতক কার্বোহাইড্রে মিষ্টি নয়, যেমন- স্টার্চ, সেলুলোজ। কার্বোহাইড্রেটকে মনোস্যাকারাইড, ডাইস্যাকারাইড, অলিগোস্যাকারাইড ও পলিস্যাকারাইড হিসেবে ভাগ করা যায়। DNA, RNA গঠনকারী পেন্টোজ শ্যুগারও কার্বোহাইড্রেট। কোষপ্রাচীর গঠনকা সেলুলোজও কার্বোহাইড্রেট। কার্বোহাইড্রেট আমাদের প্রধান খাদ্য উপাদান। চাল, গম, আলু এসবই কার্বোহাইড্রে প্রধান উৎস।

অ্যামিনো অ্যাসিড : প্রোটিন (আমিষ) গঠনকারী একক হলো অ্যামিনো অ্যাসিড। অ্যামিনো অ্যাসিডে, অ্যামিনো গ্রু NH_2 এবং কার্বোক্সিল গ্রুপ -COOH অবশ্যই বিদ্যমান থাকে। প্রধানত বিশ প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিড বিভিন্ন অনুক্র সজ্জিত হয়ে জীবদেহের সকল প্রোটিন (সকল এনজাইমসহ) গঠন করে থাকে। এই প্রোটিনের মাধ্যমেই জিন কর্ত নিয়ন্ত্রিত বৈশিষ্ট্য জীবদেহে প্রকাশিত ও স্থানান্তরিত হয়।

প্রোটিন : প্রোটিনের বাংলা করা হয়েছে আমিষ। আমাদের খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডাল রাখা হয়েছে প্রোটিনে উৎস হিসেবে, কারণ জীবদেহে প্রোটিনের উপস্থিতি অপরিহার্য। জীবদেহের DNA গঠনেও প্রোটিন প্রয়োজনীয়, সক এনজাইমই প্রোটিন। এনজাইম না থাকলে জীবকোষের সকল ক্রিয়া-বিক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে, প্রোটিন না থাকলে জিনে প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাবে।

সুক্রোজ : চিনি হলো সুক্রোজ-এর উদাহরণ। এটি একটি ডাইস্যাকারাইড কার্বোহাইড্রেট। উদ্ভিদদেহের প্রধ ডাইস্যাকারাইড হলো সুক্রোজ গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ মিলিতভাবে গঠন করে সুক্রোজ। গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ রিডিউসি শ্যুগার হলেও সুক্রোজ রিডিউসিং শ্যুগার নয়। পাতায় প্রস্তুত কার্বোহাইড্রেট সুক্রোজ হিসেবে বিভিন্ন অঙ্গে প্রবাহিত হয়। এর আণবিক সংকেত $C_{12}H_{22}O_{11}$ মধুর প্রধান কার্বোহাইড্রেট

এনজাইম : এনজাইম হলো জৈব-অনুঘটক যা জীবদেহে বিক্রিয়ার হারকে ত্বরান্বিত করে কিন্তু বিক্রিয়ার পর নিজে অপরিবর্তিত থাকে। সকল এনজাইমই প্রোটিন। সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট এনজাইম জীবদেহে কোনো নির্দিষ্ট বিক্রিয়া বি বিক্রিয়া গ্রুপকে প্রভাবিত করে। একটি নির্দিষ্ট এনজাইমের অ্যামিনো অ্যাসিডের সংখ্যা ও অনুক্রম সুনির্দিষ্ট। সাবস্ট্রেট-এ ধরন অনুসারে বা বিক্রিয়ার ধরন অনুসারে বা সাবস্ট্রেট-বিক্রিয়ার মিলিত বৈশিষ্ট্য অনুসারে এনজাইমের নামকরণ করা হয়। এনজাইমের শ্রেণিবিন্যাস করা হয় গঠন বৈশিষ্ট্য অথবা বিক্রিয়ার ধরন অনুসারে। এনজাইমের কার্যকারিতা তাপমাত্রা, pH ইত্যাদি পরিবেশীয় প্রভাবক দ্বারা প্রভাবিত হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ)

১। নিচের কোনটি রিডিউসিং শ্যুগার ?
(ক) গ্লুকোজ (খ) স্টার্চ (গ) সেলুলোজ (ঘ) গ্লাইকোজেন

২। লিপিডের বৈশিষ্ট্য হলো–
(i) পানির চেয়ে হালকা
(ii) হাড়ের সন্ধিস্থলে লুব্রিকেন্ট হিসেবে কাজ করে
(iii) ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল দ্বারা গঠিত